পায়ে চলার পথ

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিশার্স লিমিটেড
১১৯ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা

পায়ে চলার পথ

[প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও কবি কল্যাণ রায়ের লাইব্রেরী ঘর।
একটা কৌচে বসে লেখাপড়ায় ব্যস্ত রয়েছেন কল্যাণ
রায়—পাশের টেবিলে হেলান দিয়ে
দাঁড়িয়ে শান্তা]

শান্তা। না মিঃ রায়, আর আমার পক্ষে এখানে থাকা সম্ভব হবে না। বেশ করে ভেবে দেখলাম, আরো আগেই আমার বিদায় নেওয়া উচিত ছিল।

কল্যাণ। কিন্তু কেন হঠাৎ বিদায় চাইছেন, সেটা কি জানতে পারি না?

শান্তা। এম্নি। বাইরের লোক—একদিন এসেছি, আর একদিন চলে যাবো, এর ভেতর আশ্চর্য্যের কি আছে?

কল্যাণ। তবু!

শান্তা। আপনার স্ত্রী আমায় জবাব দিয়েছেন।

কল্যাণ। তার মানে?

শান্তা। তার মানে অতি সহজ—আপনার মেয়ের শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করে তিনি আমায় বাড়ীতে রেখেছিলেন। এখন তিনি মনে করেছেন, আমাকে দিয়ে কাজ ঠিক মতো হচ্ছে না।

কল্যাণ। কেন, খুকী ত খাসা ইংরেজী বলছে। সাহিত্য রচনায় দিকেও তার বেশ হাত খুলেছে—তাছাড়া বাইরের জ্ঞান···

শান্তা। তিনি যদি মনে করেন, এই যথেষ্ট নয় এবং অন্য লোক দিয়ে এর চেয়ে ভালো কাজ হবে, তাহলে আমার কি বলার থাকতে পারে?

কল্যাণ। কিন্তু আমার ত কিছু বলার থাকতে পারে। যা সঙ্গত নয় এমন কথা···

শান্তা। দেখুন মিঃ রায়, ভেবেছিলাম কোন কথাই বলবো না আপনাকে, যেমন নিঃশব্দে এসেছিলাম একদিন, তেম্নি নিঃশব্দেই চলে যাবো আর একদিন। কিন্তু আপনার এই···

কল্যাণ। বলুন বলুন মিস শান্তা। এমনও ত হতে পারে যে আপনি ভুল বুঝেছেন, অথবা আমার স্ত্রীই ভুল বুঝেছেন।

শান্তা। মিঃ রায়, আপনার স্ত্রীর ধারণা, আমি তাঁর সাংসারিক শান্তি নষ্ট করছি—মানে—

কল্যাণ। মানে?

শান্তা। মানে আমাকে তিনি সন্দেহ করছেন।

কল্যাণ। আপনার মতো মহিলাকে তিনি সন্দেহ করছেন? কি বলে সন্দেহ করছেন?

শান্তা। মিঃ রায়, আপনি এত বড় পণ্ডিত, কিন্তু বৈষয়িক জ্ঞান আপনার একেবারেই নেই। হাজার হলেও আমি পর ত—তার ওপর অবিবাহিতা—আপনার সঙ্গে আমার এই মেলামেশাটা তিনি ভালো চোখে দেখছে না। বুঝেছেন!

কল্যাণ। হুঁ। কিন্তু তাঁর এ সন্দেহ ত ভুল!

শান্তা। ভুল কি ঠিক সে সম্বন্ধে আপনি যে-রকম মনে করেন, তিনি সে-রকম করেন না। তাঁর মনে হয়েছে, আমি আসার পর থেকেই তাঁর সম্পর্কে আপনি উদাসীন হয়েছেন—তাঁকে উপেক্ষা করছেন, আর···

কল্যাণ। আর?

শান্তা। সে আমি বলতে পারবো না মিঃ রায়। মোট কথা, তাঁর বিশ্বাস—আমাকে এখনি বিদায় না করলে, তাঁর সংসার ছারখার হবে, আপনার অধঃপতনের আর কিছুই বাকী থাকবে না—আপনাদের একমাত্র মেয়েরও সর্ব্বনাশ হবে।

কল্যাণ। তাই আপনি ঠিক করেছেন···

শান্তা। দু'এক দিনের মধ্যেই বিদায় নেব। তিনি বাড়ীর গিন্নী—তাঁর যেখানে এই মত!

কল্যাণ। কিন্তু আমিও ত বাড়ীর কর্ত্তা। আমি যদি আপনাকে যেতে না দিই!

শান্তা। না মিঃ রায়, আমার ব্যাপার নিয়ে আপনাদের স্বামী-স্ত্রীতে মতদ্বৈধ হয়, ঝগড়াঝাঁটি হয়, এ আমি চাইনে। এ যাতে না হয়, সেই জন্যেই ত আমি চলে যেতে চাইছি।

কল্যাণ। তাহলে একটা মিথ্যাকে অপ্রতিবাদে মাথা পেতে নেওয়া হবে না কি আপনার?

শান্তা। আপনি পুরুষ মানুষ—আপনি হয়ত বুঝবেন না। কিন্তু মেয়েমানুষের পক্ষে এ এমি একটা জিনিষ যে এ নিয়ে প্রতিবাদ করতে গেলে অপবাদটা আরো কায়েমি হয়ে বসে।

কল্যাণ। বুঝলাম। কিন্তু আপনি চলে গেলে আমার অবস্থাটা কি হবে, ভেবে দেখুন ত।

শান্তা। কি আবার হবে? আপনার মা আছেন, স্ত্রী আছেন, সন্তান আছে, টাকা-পয়সা আছে, মান-খাতির আছে।

কল্যাণ। মিস শান্তা, যদি বোঝাতে পারতাম আপনাকে যে বাইরে থেকে দেখলে আমার জীবনে কিছুরই অভাব নেই, কিন্তু ভেতরটা একদম শূন্য—মরুভূমির মতো খাঁ-খাঁ করছে, সেখানে আমার কেউ নেই, কিছু নেই!

শান্তা। কেন মিঃ রায়?

কল্যাণ। তার কারণ, আমার যেখানে সত্যিকার জীবন, সেই জ্ঞানসাধনার জায়গায় কারুকে আমি দোসর পাইনি। আমার অন্তরের সব চেয়ে গভীর কথাগুলো চিরদিন রাখতে হয়েছে আমার নিজের মধ্যে আড়াল করে—আর বাইরে করতে হয়েছে বেঁচে-থাকার নামে মস্ত একটা ছলনার অভিনয়।

শান্তা! কিন্তু বাইরের জগতে···

কল্যাণ। শুধু বাইরের জগৎ নিয়েই ত আর জীবন নয়, ভেতরের জগৎটাও যে আছে, সেখানে আজীবন উপোষী থেকে বাইরে শুধু খ্যাতির···মিস শান্তা, তাই ত আপনাকে যেদিন পেয়েছিলাম, সেদিন থেকে জীবনে আমার এসেছে সত্যিকার একটা সহ-অনুভূতির স্পর্শ—তার ফলেই ঘরোয়া জীবনটা আমার হয়েছে সুসহ। ভালো করে বুঝতেও পারিনি, কিন্তু অজ্ঞাতসারেই আপনাকে আমি গণ্য করেছি আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু বলে।

শান্তা। আর তাতেই হয়েছে আপনার সংসারে এই অনর্থের সৃষ্টি।

কল্যাণ। হক, তবু আমি ত বেঁচে গেছি—আর আমার সেই বাঁচবার ফলে বেঁচেছে আমার সাধনা! মিস শান্তা, আপনি যাবেন না—শুধুর জন্যেই আমারি জন্যে আপনাকে থাকতে হবে।

শান্তা। ভেবে দেখবো মিঃ রায়। কিন্তু মনে হচ্ছে, হয়ত আপনার অনুরোধ রাখার শক্তি হবে না আমার। [প্রস্থান]

[বনলতার প্রবেশ]

বনলতা। রাত্রে তুমি কি খাবে?

কল্যাণ। কিছু না।

বনলতা। কেন, অসুখ করেছে নাকি?

কল্যাণ। লতা, দেহ জিনিষটা চোখে দেখা যায় বলে তার সুখ-অসুখটা চট করে ধরা পড়ে—মনটায় নজর চলে না বলে তার ব্যাধিটা চিরদিনই থাকে গোপন, সেটাকে কেউ ধর্ত্তব্যের মধ্যেই আনে না।

বনলতা। কি তোমার মনের কথা, কোথায় তোমার দুঃখ, তা ত আমায় বলো না কোনদিন!

কল্যাণ। কি হবে বলে? তার প্রতিকার তোমার সাধ্যের বাইরে। তবে এতদিন সেটা ছিল তোমার স্বাভাবিক অক্ষমতা—এখন আবার তারি সঙ্গে সুরু হয়েছে তোমার স্বেচ্ছাকৃত দুর্ব্যবহারের দাপট।

বনলতা। ও-মা! আমি দুর্ব্যবহার করছি তোমার সঙ্গে? কি করছি একটু বলো—অমন চুপ করে থেকো না, না হয় সাজা দাও, ধমকাও!

কল্যাণ। আমায় আর উত্যক্ত করো না লতা। বেশ বুঝতে পেরেছি, আমার অস্তিত্বকে প্রতি মুহূর্ত্তে বিষিয়ে তোলাতেই তোমার আনন্দ—তোমার এই ভালোমানুষীর ভাণটা তাই আমার সবচেয়ে বেশী অসহ্য ঠেকে।

বনলতা। আমার ত সবই আজ তোমার অসহ্য ঠেকে। কিন্তু দু'বছর আগেও এমন ছিল না—তখন এই মুকুকেই ভালোবাসতে। এর সঙ্গেই সব বিষয়ে যুক্তি-পরামর্শ করতে, একে নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলে। তখন আমাকে দেখলেই এমন সর্ব্বশরীর তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠতো না!

কল্যাণ। আর এখন?

বনলতা। এখন কি হয়েছে, তা ত নিজেই জানো!

কল্যাণ। লতা, তুমি কি চাও খুলে বলবে?

বনলতা। আমি কিছুই চাইনে। তুমি সুখী হও, তুমি শান্তি পাও—তার জন্যে আমায় যদি দূর হয়ে যেতে হয়, তা-ও যাবো, কিন্তু এমন করে গুমরে গুমরে আর তুমি নিজেকে কষ্ট দিয়ো না।

কল্যাণ। তাহলে তুমি বাঁচবে? আমাকে কষ্ট পেতে দেখলে তবেই ত তোমার আনন্দ!

বনলতা। এগারো বছর ঘর করার পরে আজ তোমার সেই ধারণা হল আমার সম্বন্ধে? এর চেয়ে আমার মরা ভালো—উঃ ভগবান!

কল্যাণ। তোমার এই বাষ্পোচ্ছ্বাসের জন্যে আমি প্রস্তুত নই। আমি শুধু জানতে চাই, শান্তা দেবীকে বরখাস্ত করা হয়েছে কি জন্যে?

বনলতা। তাঁকে আমার আর দরকার নেই বলে।

কল্যাণ। তোমার ইচ্ছাই কি এ সম্বন্ধে চরম?

বনলতা। নিশ্চয়।

কল্যাণ। লতা, ভুলে যেয়ো না এ বাড়ী আমার।

বনলতা। সে আমি কোনদিনই ভুলে যাইনি। যদি বা ভুলতাম, আজকাল যে-রকম ব্যবহার করছো, তাতে আর ভুলবার সাধ্যি কি? কিন্তু তুমিও ভুলে যেয়ো না যে আমি এ বাড়ীর বৌ—চাকরাণীও নই, মাষ্টারণীও নই!

কল্যাণ। ইস, তুমি এতদূর নেমে গেছো! যার সঙ্গে কোন দিক থেকেই তোমার তুলনা হয় না, শুধু গরীব বলেই যে মাইনের জন্যে আর দুটো ভাতের জন্যে তোমার বাড়ী কাজ করে, তাকে তুমি মানুষ মনে করো না! তুমি কি তা কি ভেবে দেখেছো কোনদিন?

বনলতা। আমি যাই হই, কারুর সঙ্গে আমার তুলনা করা পছন্দ করিনে। আমাকে ভালো না লাগে, দরকার না থাকে, স্পষ্ট বলে দাও—আমার যেখানে ঠাঁই হয় চলে যাবো।

কল্যাণ। লোককে অপমানিত করে বিদায় করা—ছি-ছি!

বনলতা। তাকে বিদায় করা যদি সম্ভব না হয়, তাহলে আমায় বিদায় করতে হবে—আমার চোখের সামনে বিদ্যেচর্চ্চার নাম করে তার সঙ্গে দিবারাত্রির ঢলাঢলি করবে, এ আর আমি সইবো না।

কল্যাণ। লতা!

বনলতা। ওতে আমি ভয় পাবো না।

[তে-তলার বারান্দা। কল্যাণবাবুর কন্যা সীমা একটা
স্কিপিং রোপ নিয়ে লাফাচ্ছে—সামে তার
ঠাকুমা কুসুমকুমারী। দূরে দেখা যাচ্ছে
বাড়ীর অন্দরটা।]

সীমা। বাড়ীটা আজকাল যেন কি হয়েছে ঠাকুমা! সকাল বেলা গিয়েছিলাম বাবাকে একটা ছবি দেখাতে, আমাকে কি রকম দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে উঠলো!

কুসুমকুমারী। অসুখ করেছে দিদি—সেই জন্যেই মেজাজ ভালো নেই।

সীমা। কি হয়েছে ঠাকুমা?

কুসুমকুমারী। এই পাঁচ রকম।

সীমা। শান্তা দিদিমণিরও যেন কি হয়েছে! দুপুর বেলা দেখলাম, বিছানা-বেডিং সব বাঁধা—চুপ করে শুয়ে আছেন মাদুরে। জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় যাচ্ছো দিদিমণি? মুখ ভারী করে বললেন, নিজের কাজ করো গে সীমা।

কুসুমকুমারী। কিছু হয়ে থাকবে—জানিনে ঠিক।

সীমা। আর মামণির ত কথাই নেই। বিকেল বেলা দেখি, ছাদে বসে বসে কাঁদছে। বললাম, কি হয়েছে মামণি? তাতে আমায় বললে, সীমু রে আমার কপাল ভেঙেছে—বলেই হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলো!

কুসুমকুমারী। তোর বাবার অসুখ কিনা—তাতেই মন ভালো নেই দিদি। ও কিছু নয়!

সীমা। কি বিচ্ছিরি বলো ত! কেউ রেগে উঠছে, কেউ কাঁদছে, কেউ গোঁজ হয়ে রয়েছে—বাড়ীটা যেন কি হয়ে গেছে! একটু ভালো লাগে না আমার।

কুসুমকুমারী। এক এক সময় এ রকম হয় দিদি। তোর বাবা সেরে উঠলেই আবার সব ঠিক হয়ে যাবে দেখিস।

সীমা। কই বললে না ত বাবার কি হয়েছে?

কুসুমকুমারী। তোর বাবার? হ্যাঁ,- এমন কিছু নয়—এম্নি একটু মনের অসুখ আর কি!

সীমা। মনের অসুখ আবার কি?

কুসুমকুমারী। বয়েস হলে বুঝবি। যখন আমার নাতজামাই আসবে না, তখন তোরও মাঝে মাঝে এম্নি হবে।

সীমা। যাঃ কি যেন!

কুসুমকুমারী। কই তুই আমায় শোনালিনে সেই নতুন গানটা?

সীমা। শান্তা দিদিমণি ত এখনো সুর শেখায়নি সবটার।

কুসুম। যা শিখেছিস তাই একটু বল না শুনি।

সীমা। শোনো—

নাহি ভয়, নাহি ভয়,
হবে জয়, হবে জয়।
এই অসহ যাতনা ব্যাধি বন্ধন,
এই আকুল কাতর মোহ-ক্রন্দন,
এই অতল ব্যথার অমারাত্রি,
হবে হবে নিঃশেষে ক্ষয়॥
ঈর্ষা অসূয়া লোভে পূর্ণ,
এই পুরানো পৃথিবী হবে চূর্ণ,
নূতন ঊষার প্রাচী-শৈলে,
নব দিনের হবে উদয়॥

কুসুমকুমারী। বেশ ত শিখেছিস। তা হ্যাঁ, কিছু খেয়েছিস বিকেল বেলা?

সীমা। না। ভালো লাগছে না কিছু খেতে।

কুসুমকুমারী। লাগবে যা, পান্থর মাকে বলে এসেছি, তোর খাবার তৈরী করে রাখতে। যা লক্ষ্মীদিদি।

[সীমা একদিক দিয়ে বেরিয়ে গেল, অন্য দিক দিয়ে এলো বনলতা।]

বনলতা। ভেবে দেখলাম মা, আমার এখন কিছু দিন যাওয়াই ভালো! দাদাকে চিঠি লিখে দিই—কাল পরশু এসে বরং···

কুসুমকুমারী। পাগল! এ সময় কখনো চোখের আড়াল হতে আছে? তাহলে যা ভয় করছো, তাই হয়ে বসবে।

বনলতা। হতে আর বাকীটা কি আছে মা?

কুসুমকুমারী। সেই জন্যেই ত বলছি, এখন কোথাও যাবার কথা মুখেও এনো না।

বনলতা। আমি থাকতে উনি ত এক দণ্ড স্বস্তি পাবেন না! দেখছেন না—ওঁর খাওয়া গেছে, নাওয়া গেছে, লেখা-পড়া গেছে—দিনরাত্তির কেমন যেন ধন্দ হয়ে রয়েছেন! এ থেকে শান্তি দিতে হবে ত!

কুসুমকুমারী। কিন্তু চোখের আড়ালে সরে গেলেই কি শান্তি দেওয়া হবে বৌমা?

বনলতা। তা হবে মা। সত্যিই ত, ওর সঙ্গে কিসে আমার তুলনা হয়? ওর রূপ আছে, বিদ্যে আছে, চাল-চলনে কথায়-বার্ত্তায় সব বিষয়ে ও ওঁর মনের মতন। ওকে সামনে দেখে আর কি করে আমাকে পেয়ে সন্তুষ্ট থাকবেন? যতদিন কারুকে হাতের কাছে পাননি, ততদিন এক রকম গেছে—এখন ত সত্যিই সেটা হওয়া কঠিন।

কুসুমকুমারী। হ্যাঁ, তুমিও যেমন! ঢলানী মাগী—সেজেগুজে থাকে, ন্যাকা ন্যাকা কথা কয়, গায়ের ওপর গিয়ে পড়ে দিনরাত্তির—পুরুষমানুষের মন ত, চঞ্চল হয়েছে। ওসব দু'দিনের নেশা—একটু শক্ত হলেই ছুটে যাবে।

বনলতা। তা নয় মা। ওর সঙ্গে ওঁর মনের সত্যিকার মিল হয়েচে—যা হয়নি আমার সঙ্গে। আমার সঙ্গে ওঁর বিয়ে হয়েছে বলেই আমি স্ত্রী, নইলে কোন দিক থেকেই ত আমি ওঁর যোগ্য নই।

কুসুমকুমারী। তা কি করে বলছো বৌমা? ও ত নিজে পছন্দ করেই বিয়ে করেছে তোমাকে। কর্ত্তা অন্য জায়গায় কথাবার্ত্তা কইছিলেন—ও-ই একদিন এসে বললে, তোমায় বিয়ে করবে।

বনলতা। সেটা বলেছিলেন কেন, তা আপনারা জানেন না মা। বাবাকে উনি খাতির করতেন—বাবা তখন মৃত্যুশয্যায়, একদিন ওঁকে অনুরোধ করলেন আমার ভার নিতে—উনিও ঝোঁকের মাথায় কথা দিয়ে ফেললেন। তারপর বিয়ে হয়ে যেতেই বুঝতে পারলেন, কাজটা ভালো হয়নি—নিজের সর্ব্বনাশ করা হয়েছে। কিন্তু তখন আর কি উপায়? মুখ বুঁজেই থাকতে হল—সাপের ছুঁচো-গেলা গোছ আর কি! তারপর যখন থেকে শান্তা এলো···

কুসুমকুমারী। সে ত আমি জানি নে মা। তবে তোমাকে ভালোবাসতে দেখেছি ত খুবই একসময়। একটু অসুখ করলেই হাঁক-ডাক করে···

বনলতা। সে হয়ত এখনো করবেন, কিন্তু আমি ত টের পেয়েছি, ভেতরে

পড়া শেখান নি, একটি পয়সা পর্য্যন্ত দেন নি পিতৃ-সম্পত্তির—উনি দোকানে কাজ করে, বিড়ি বিক্রি করে নানা রকমে মানুষ হয়েছেন, তারপর বিমলাবাবু দেশে এলে, উনি তাঁর সাহায্য পেয়ে···

তারিণী। এই সব বলতেন দাদা? বলেছি ত দাদার ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান ছিল না, নইলে আর বাবা শুধু শুধু বড় ছেলেকে ত্যজ্যপুত্র করেন? বাবা ছিলেন···

হরিচরণ। সেই অধার্ম্মিক দাদার টাকা-পয়সা···

তারিণী। আহা ও-কথা তুলছেন কেন? ও ত আমাদের দায়, আপনি বাইরের লোক, আপনি আর ওর মর্ম্ম কি বুঝবেন? আপনি ছিলেন তাঁর বন্ধু, আর আমরা যে সহোদর ভাই।

হরিচরণ। ঐ মহিলাটি কে আসছেন?

তারিণী। কৈ? ওঃ, ও হেম, আমাদের বোন। ওর বিয়ে দেওয়া নিয়েই ত দাদার সঙ্গে বাবার গোল বাধলো, বাবা ঠিক করলেন এক কুলীন পাত্র, দাদা বললেন, না, ও বুড়োর সঙ্গে কিছুতেই দেওয়া হবে না বিয়ে—এক হীন জাতের ছোকরা ডাক্তার যোগাড় করলেন তিনি, শেষটা বাবা জোর করেই দিলেন ওর বিয়ে, আর দাদা···

হরিচরণ। সেই থেকেই বাড়ী ছাড়লেন!

[হেমাঙ্গিনীর প্রবেশ]

তারিণী। ভাই। এই যে হেম এসেছে। আয় হেম, আয়—হেম রে, দাদা আমাদের নেই! আহা!

হেম। ওহো দাদা গো, তুমি কোথায় গেলে গো? এমন দাদা কি মানুষের হয় গো? দাদা ত নয়, যেন মহাদেব! আমি পোড়ামুখী বেঁচে রইলাম, আর তুমি চলে গেলে, আজ তিরিশ বছর তোমার সঙ্গে যে দেখা নেই গো!

হরিচরণ। স্থির হন, মানুষ ত অমর নয়—বড্ড কষ্ট পাচ্ছিলেন তিনি!

তারিণী। আহা-হা, আপনি কি বুঝবেন মশায়, ওর কোথায় লেগেছে? ওর বিয়ে নিয়েই যে দাদা আমাদের বিবাগী হন! আর বিয়ের এক বছর পরেই যে ওর হাতে লোহা···আহা-হা!

হরিচরণ। তারপর?

তারিণী। অবিশ্যি আমার ভগ্নিপতির বয়স হয়েছিল এই যা, নইলে ভদ্রলোকের বিষয়-সম্পত্তি টাকা-পয়সা বেশ ছিল, বাবা ত আর হাত-পা বেঁধে ঐ একটি মেয়েকে জলে ফেলে দেন নি!

হরিচরণ। হুঁ।

হেম। ওঃ হো হো, বাবা গো, তুমি আজ কোথায় গো? তোমার চোখের মণি যে দাদা…

[মেজো ভাই অন্নদাচরণ ব্যস্ত সমস্ত হয়ে ঢুকলেন]

অন্নদা। যাক, তোরা এসে পড়েছিস! তা বেশ, বেশ, আমার একটু দেরী হয়ে গেল। তা হেমও এসেছিস, তা বেশ, বেশ, সবই অদেষ্ট…তা…

তারিণী। আমাদের মেজদা।

হরিচরণ। বুঝেছি।

অন্নদা। ইনি?

তারিণী। দাদার বন্ধু এটর্নি…

অন্নদা। ওঃ, তা আমি ত ঠিক সময়ে আসতে পারি নি—তা দাদার বিষয়-সম্পত্তির কাগজপত্র, ব্যাঙ্কের হিসেব-কেতাব, ঘরোয়া জিনিষ-পাত্তি সব ঠিকঠাক আছে ত? তা ওসবের বন্দোবস্ত করে ফেলতে হয়, আর সকলে মিলে বসে, কি বলে গিয়ে, একটা শ্রাদ্ধোর ·

হরিচরণ। ব্যস্ত হবেন না। তাঁর কাগজপত্র সমস্তই লোহার সিন্দুকে রেখে শীল করা হয়েছে—মূল্যবান জিনিষ-পত্রও সমস্তই ঘরে আটক করা হয়েছে—তাঁর উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত হলেই ও-সবের বন্দোবস্ত হয়ে যাবে।

অন্নদা। উত্তরাধিকারী? আমরাই ক'ভাই-বোন তাঁর উত্তরাধিকারী, তাঁর ত ব্রহ্মাণ্ডে আর কেউ ছিল না, আমরাই সব।

হরিচরণ। তা বললে ত হবে না, ছাব্বিশ বছর বয়সে তিনি বাড়ী-ছাড়া, তখন আপনাদের পিতা বেঁচে, তারপর সারা জীবন তিনি কখনো ইউরোপে, কখনো আমেরিকায়, কখনো বর্ম্মায় কাটিয়ে, শেষ কালটা কলকাতায় ছিলেন—এখানেই তাঁর মৃত্যু হল ষাট বছর বয়সে—এই দীর্ঘ সময়ের ভেতর কোথাও তিনি বিয়ে-থাওয়া …

অন্নদা। ছি-ছি, বলেন কি মশায়? এ বংশের ছেলে অত ছ্যাচড়া হয় না। দাদা আমাদের ছিলেন অতি নিষ্ঠাবান।

হরিচরণ। তবু আইনের খাতিরে আপনাদের অপেক্ষা করতেই হবে। আর আমিও তা করতে বাধ্য করবো।

তারিণী। মানে?

অমলা। বাধ্য করবেন? আপনি কে? আপনাকে পোঁছে কে? দাদার বন্ধু ছিলেন—দাদা নেই, আপনি এবার সরে পড়েন ভালোই, নইলে…

হেম। বটেই ত! বলে, যার ধন তার ধন নয়…

হরিচরণ। আপনারা যাই বলুন, এছাড়া আমার উপায় নেই। আপনাদের দাদা অন্তিমকালে সমস্ত কিছুর ভার দিয়ে গেছেন আমার হাতে—আমি রীতিমতো তদন্ত না করে কিছুই করতে পারি না, বুঝলেন?

অমলা। আচ্ছা, দেখি আপনি করতে পারেন। আদালত আছে—এ মগের মুল্লুক নয়।

তারিণী। ঠিকই ত।

হেম। তা নয়ত কি?

[ঐ বাড়ীর দোতালা। হেমাঙ্গিনী এবং ছোট বৌ প্রমীলা কথা কইছে]

হেম। দেখো ছোটবৌ, কিছু লুকোবার চেষ্টা করো না—ব্যাপার কিন্তু অনেক দূর গড়াবে।

প্রমীলা। আমি কি জানি ও-সবের? আমি মুখ্যু মেয়েমানুষ, আমার সঙ্গে পরামর্শ করে কি তিনি উইল করেছেন? কত ডাক্তার, উকিল, মোক্তার আসতো তাঁর কাছে!

হেম। কিন্তু এতদিন ধরে ত তুমি ছিলে—বাড়ীতে একটা লেখা-পড়ার ব্যাপার হয়ে গেল, তুমি সে সম্বন্ধে কোন কাণাঘুষোও শুনতে পেলে না, এ কি আর হয় কখনো?

প্রমীলা। কি করে পারবো? ওষুধপত্তি তৈরি করা, রুগীর গা-মোছানো, মাথা ধোয়ানো, তাঁর বিছানা-বালিশ পরিষ্কার করা—কাজ কি কম ছিল? দিনরাত্তির ত থাকতাম ঐ নিয়ে!

হেম। আর দাদার কাছে যেতে না কখনো?

প্রমীলা। কেন যাবো না? সর্ব্বদাই যেতাম। কিন্তু তিনি ভাসুর, আমি বৌ-মানুষ, আমার সঙ্গে আর কি কথা হবে তাঁর? এটা দাও, ওটা করো, এই পর্য্যন্ত কথা হত!

হেম। বুঝলাম, তুমি ভাঙবে না কিছু। এই করে তুমি নিজেও ফাঁকে পড়বে, আর সকলকেও পথে বসাবে।

প্রমীলা। সে কি? আমি ভালোতেও নেই, মন্দতেও নেই··

হেম। আরে নেকী, তুমি বোঝো কিছু? ঐ হরিবাবু লোকটা বলছে, দাদা নাকি উইল করে সর্ব্বস্ব কাকে দিয়ে গেছেন, আমাদের জন্যে এক কাণা কড়িরও ব্যবস্থা নেই!

প্রমীলা। তোমারা কি মনে করছো, সে আমি? তাঁর ধন, তিনি যাকে খুশী তাকে দিয়েছেন—তাতে আমার বলবার কি আছে? আর বললেই বা তা শুনছে কে?

হেম। ওরে আমার সাধুপুরুষ রে! তাই দাদা মরবার আগে থেকেই এসে জেঁকে বসেছেন—যাতে কিছু হাতিয়ে নিতে পারেন। তা শোনো, উইলে কি আছে না আছে এখনো খুলে বলো—মেজদা আছে, সেজদা আছে, যাহক একটা হিল্লে হবে। নইলে এরপর কিন্তু কেঁদে রাত পোয়াবে না!

[অন্নদার প্রবেশ]

অন্নদা। তা, তা হেম, পারলি কিছু বের করতে?

হেম। হ্যাঁ, সেই হিঁদু কিনা!

অন্নদা। তাহলে দেখছি সোজা আঙুলে ঘি বেরুবে না। ঘরের বৌ, আমি কোন খিটকেল করা পছন্দ করি নে, নইলে তারিণী যা বলছে, সে ত বিষম কথা!

হেম। কি মেজদা

অন্নদা। বলবোই বা কি? এসব বড়ই লজ্জার কথা! হরিবাবু বলছেন, দাদার মাথার নীচে আলমারী, হাতবাক্স এসবের চাবি থাকতো, ছোট বৌমা সেটা জানতেন—দাদা মারা যাবার পরে নাকি দেরাজ থেকে ক'খানা গিনি আর কিছু সোনার জিনিষপত্র পাওয়া যাচ্ছে না। তাঁর সন্দেহ···

হেম। বুঝতেই পারছি। তা তোমরা কি ব্যবস্থা করছো?

[তারিণীর প্রবেশ]

অন্নদা। তারিণী বলছে···ঐ যে তারিণী আসছে, ওকেই জিজ্ঞাসা করো সব। ওরে তারিণী, বৌমা নাকি কিছুই বলবেন না!

তারিণী। তাহলে যা দেখছি, পুলিশই ডাকতে হয়। দাদা আমাদের সকলেরই দাদা, সোনা দানা যা তাঁর ছিল, সে আমাদের সকলেরই—তা যে কেউ একলা নেবেন, এ ত আর হতে পারে না!

হেম। বটেই ত।

প্রমীলা। এ কি, সকলে মিলে আমায় চোর ঠাউরাচ্ছেন! আমি বড়ঠাকুরের দেরাজ থেকে...ভগবান নেই, এত অবিচার সইবে? মেয়েমানুষ হয়ে তুমি ঠাকুরঝি···

হেম। আহা আমার সতীরে, কিছু জানেন না উনি—ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানেন না! ডাকো তোমরা, পুলিশই ডাকো।

প্রমীলা। হরিবাবুকে জিজ্ঞাসা করো না তোমরা—বড়ঠাকুর নিজে হাতে আমায় ক'খানা গিনি, আর কিছু সোনার জিনিষ দিয়ে গেছেন কিনা?

[হরিচরণের প্রবেশ]

হরিচরণ। আপনারা আবার কি নিয়ে গোলমাল সুরু করেছেন?

তারিণী। গোলমালটা কি মশাই? দাদার সম্পত্তি ভাইরা নেবে, এতে গোলমাল কোনখানটায়? আপনি ত আছেন কি করে সব বাগাতে পারেন, সেই তালে—ও মাগীও সেই মৎলব নিয়েই আগে ভাগে এসে হাজির হয়েছে। আপনারা ভেবেছেন বুঝি, আমরা অম্নি অম্নি ছেড়ে দেব?

হরিচরণ। তা দেবেন কেন? আপনারা যতটা যা পারেন, চেষ্টা করেই দেখবেন। একটা কথা শুধু মনে রাখবেন, আপনাদের দাদা যা-কিছু রেখে গেছেন, তাতে আপনাদের কারুর এক কণা অধিকার নেই।

অন্নদা। কেন নেই?

হরিচরণ। তিনি তাঁর উইলে সবই তাঁর ন্যায়সঙ্গত ওয়ারিশকে দিয়ে গেছেন। শুধু ছোট বৌমাকে ক'খানা গিনি, আর দু-একটা কি জিনিষ হাতে করে দিয়ে গেছেন, সে তাঁর সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে।

অন্নদা। তাঁর আবার ওয়ারিশটা এলো কোথা থেকে?

হরিচরণ। যথাসময়েই দেখতে পাবেন।

তারিণী। ওসব ধাপ্পাবাজী রাখুন, আমরা তাঁর উইল দেখতে চাই।

হরিচরণ। মজা এই যে উইলখানিও চুরি হয়েছে—তাঁর আমরণ থেকে আমারি সামনে সেটা চাবি-বন্ধ করা হয়েছিল, তারপর সেটা আর বের করা হয় নি, কিন্তু এখন দেখছি, সেটা আর সেখানে নেই!

অন্নদা। কোথায় গেল তাহলে?

হরিচরণ। গণৎকার নই, বলতে পারি না। তবে তাতে যাবে-আসবে না কিছু, আইনসম্মত ওয়ারিশ এলে বিনা উইলেই তাঁর উত্তরাধিকার পেতে পারবেন—আমি ত আশা করছি, আজই তাঁর সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে করিয়ে দিতে পারবো।

তারিণী। আমি যদি বলি, আপনিই উইল চুরি করেছেন!

হরিচরণ। বলুন, কিন্তু দু'একদিনেই বুঝবেন, সেটা ঠিক নয়।

[প্রস্থান]

তারিণী। আচ্ছা যাক না কোথায় যাবে, আদালত ত আছে। আমার নাম মামলাবাজ তারিণী সান্ন্যাল।

অন্নদা। তা দাঁড়া তারিণী, আমিও যাচ্ছি—যাহক একটা পরামর্শ করতে হয়। আয় হেম, তুইও আয়—এত ভালো কথা নয়!

[ছোট বৌ ছাড়া সকলের প্রস্থান]

[বনমালীর প্রবেশ]

বনমালী। কি ভোলঘোল কাণ্ড! দাদা মারা গেলেন, সে জন্তে কারুর এক ফোঁটা দুঃখ নেই—কি করে তাঁর সর্বস্ব দখল করা যায়, তাই হল ওঁদের একমাত্র ভাবনা। ছি-ছি!

প্রমীলা। উইল চুরি হয়েছে জানো?

বনমালী! শুনলাম। তা হয়েছে হকগে—দাদাই গেলেন, তা তাঁর সম্পত্তি—যে পায় সে পাকগে!

প্রমীলা। আচ্ছা উইল না পাওয়া গেলে কি হবে?

বনমালী। কি জানি কি হবে। ওয়ারিশ প্রমাণ করার জন্তে সব মরবে আর কি মামলা-মোকদ্দমা করে!

প্রমীলা। তুমিও করবে ত?

বনমালী। কি জন্তে? দাদা হাতে করে যা দিয়ে গেছেন, তার বেশী আমাদের দরকার কি?

প্রমীলা। কেন তুমিও ত একজন...

বনমালী। ও সব কথা ভাবায় আমাদের কোন লাভ নেই ছোট বৌ, আজীবনই গেল অভাব-দুঃখে!

প্রমীলা। কিন্তু উইল কে চুরি করেছে জানো?

বনমালী। কে?

প্রমীলা। আমি।

বনমালী। সে কি? অ্যাঁ, সে কি? কি জন্যে করলে তুমি?

প্রমীলা। উইলে তিনি সব দিয়ে গেছেন তাঁর একমাত্র মেয়ে ডলীকে।

বনমালী। একমাত্র মেয়ে ডলীকে?

প্রমীলা। হ্যাঁ, কানপুরে থাকে সে—তার মাকে বড়ঠাকুর বিয়ে করেছিলেন ওখানে থাকতে।

বনমালী। ওঃ, তা সে উইল তুমি চুরি করলে কেন?

প্রমীলা। কেন? তাহলে আমরাই বড়ঠাকুরের সম্পত্তিটা ভাগাভাগি করে নিতে পারবো। এরপর ডলী যখন খবর পাবে, তখন আর কি করবে আমাদের? তাছাড়া সে যে এত দূরে আসবে, তারই বা ভরসা কি?

বনমালী। কি করে চুরি করলে তুমি?

প্রমীলা। চাবি কোথায় থাকে, আমি জানতাম। একদিন বড়ঠাকুর যখন অজ্ঞান হয়ে গেলেন, সেই ফাঁকে সিন্দুক খুলে আমি বের করে নিলাম উইল।

বনমালী। তারপর?

প্রমীলা। তারপর উনুনে পুড়িয়ে ফেললাম।

বনমালী। যার বাপের সম্পত্তি, তাকে ফাঁকি দিয়ে সর্ব্বস্ব নেব আমরা? কেন, আমরা ভিক্ষে করে খেতে পারবো না? এ তুমি কি করেছো—অ্যাঁ? এসো, এক্ষুণি এসো তুমি, ওদের বলবে চলো যে দাদার মেয়ে আছে—এ সম্পত্তি আমাদের নয়—তুমি উইল দেখেছো...ছি-ছি!

প্রমীলা। যদি তারপর কিছু হয়?

বনমালী। হবে। দু'জনেই জেলে যাবো—কিন্তু তাই বলে জেনে শুনে একটা মেয়েকে ফাঁকি দেবো? দাদার মেয়ে...ছি-ছি, এই কি কাজ হল? হলামই বা গরীব, আমরা মানুষ ত!

[ঐ বাড়ীর তে-তলা। অন্নদা, তারিণী ও হেমাঙ্গিনী
যুক্তি-পরামর্শ করছেন]

অন্নদা। তা, তা ছোটবৌমা একটা বুদ্ধির কাজই করেছেন বলতে হবে—উইলখানা যে খতম করেছেন, এতে আমাদের কাজ অনেকটা সোজা হয়ে গেছে।

হেম। ও কি আর আমাদের জন্যে করেছে মনে করো মেজদা? ও করেছে নিজের জন্যেই।

তারিণী। তা ত আর হতে পারবে না—আমরা থাকতে সর্ব্বস্ব একা হাত করবে কি করে?

হেম। পারবে না, তবে মৎলবটা তাই ছিল। দেখেছো কি শয়তান মেয়েমানুষ! এদিকে বড়ঠাকুর বলে কেঁদে অজ্ঞান, ওদিকে বড়ঠাকুর ভাঙায় থাকতেই তাঁর কাগজপত্র হাত-সাপাই করেছে। যাহক বংশ বটে!

অন্নদা। মরুকগে, তাতে আমাদের যখন সুবিধেই হয়েছে, তখন ও-কথায় আর কাজ কি? উইল যখন নেই, তখন ছুঁড়ীকে ভাগানোর পথে আর ত কোন বাধা নেই, অনায়াসেই বলা যাবে···

তারিণী। কে তুমি বাছা? তোমার মাকে যে আমাদের দাদা বিয়ে করেছিলেন, তার কোন লেখাপড়া আছে? আমরা তাঁর সহোদর ভাই-বোন, কস্মিনকালে আমরা তোমাদের নামগন্ধ জানলাম না, আর আজ তিনি নেই, আজ তুমি এসে দাঁড়ালে, কিনা তুমি দাদার মেয়ে, তাঁর ধনসম্পত্তির একমাত্র ওয়ারিশ! ও সব ধাপ্পাবাজী চলবে না!

অন্নদা। আসলে ও হল হরিবাবুর কারসাজী। ঐ ব্যাটাই ছুঁড়ীকে খাড়া করেছে—হয়ত ওর মাগী টাগী হবে—দাদার মেয়ে সাজিয়ে ওর হাতে দিয়ে সব গাফ করবার চেষ্টায় আছে।

হেম। আমারো কিন্তু তাই মনে হয়। মাগীর যে-রকম ঢং ঢাং দেখলাম, সে ত গেরস্ত ঘরের মেয়ের মতো নয়। কাল যার বাপ মরেছে, তার কখনো ঠোঁটে রং, আর চোখে চশমা দেবার সাধ থাকে? আরে ছি!

তারিণী। তা তোর সঙ্গে আলাপ-সালাপ কিছু হয়েছে?

হেম। রামো চন্দর! এসে সরাসরি গিয়ে উঠেছে দাদার ঘরে—ঐ

অনামুখো হরিচরণের সঙ্গে কি সব গুজগুজ করে পরামর্শ করেছে। আমাদের কি খুঁজেছে, না ডেকেছে?

তারিণী। তাতে আমাদের ভারী বয়ে গেল! তা সে দাদার মেয়েই হন, আর হরিবাবুর রাখনীই হন, বাছাধনকে ফিরতে হবে মুখ কালি করে—এ তোমায় আমি বলে রাখলাম হেম। ও সব রাম-চালাকির আমি ধার ধারি না!

হেম। ছোট বৌ কিন্তু এরি মধ্যে কি করে জমিয়ে নিয়েছে। দেখি, দু'জনে মুখোমুখি চেয়ারে বসে কি সব সলা-পরামর্শ হচ্ছে।

তারিণী। তা আর নেবে না? ওরা হল জাত-ভিখিরি—দেখছে, দাদার সম্পত্তি কড়াক্রান্তিও আর পাওয়া যাবে না, সব চলে যাবে এই ছুঁড়ীর হাতে—সঙ্গে সঙ্গে ওকে জপাতে সুরু করে দিয়েছে, যাতে কিছু···

হেম। তা নয় ত কি! আমরা সবাই রয়েছি—এই তোমরা রয়েছো দুই উপযুক্ত কাকা, আমি রয়েছি একটা পিসি, তুই যদি সত্যিকার আপনার লোকই হবি ত তোর কি একবার আক্কেল হল না যে এসে আমাদের একটা করে দণ্ডবং করবি? যেমন মানুষ, ঠিক তেমনি মানুষই চিনে নিয়েছে। ঝাঁটা মারি অমন ভাইঝির মুখে!

অন্নদা। এ জন্যে দায়ী ঐ হরে ব্যাটা। নইলে ছোট্‌বৌ ত ইচ্ছেয় হক, অনিচ্ছেয় হক, ভালো কাজই করেছিল!

তারিণী। ঐ হরিচরণের নষ্টামি আমি ভালো করে দিচ্ছি, তুমি দেখো না!

[বনমালীর প্রবেশ]

আয় বনা, বৌমা কাজ ভালোই করেছেন—তোর চেয়ে তাঁর বুদ্ধি আছে। এতদিন ত ছিলি দাদার কাছে, আখেরের ব্যবস্থা কিছুই করতে পারিসনি—তিনি যাই উইলখানা···

বনমালী। বলো কি সেজদা? ছোট বৌ ভীষণ অন্যায় করেছে। দাদার মেয়ে···

তারিণী। থাম, থাম, বাজে বকিসনে। দাদা কি বিয়ে করে ছিলেন যে তাই তাঁর মেয়ে?

বনমালী। আহা তোমরা জানো না। কানপুরে থাকতে দাদা···ওর খুড়ীমাকে সব কথা বলেছে ডলী।

অন্নদা। কে? ডলী? বেলী, চামেলী, হেলী, অনেক নাম শুনেছি বাবা—ডলী, ইস.ভদ্রলোকের মেয়ের নাম ডলী, আর এই হল দাদার মেয়ে! বনা তুই কি ঘাস খাস নাকি?

হেম। সত্যি ছোড়দা, বয়স হয়েছে, কিন্তু তোমার কিচ্ছু বুদ্ধি হয় নি। দেখতে পাচ্ছো না, ও একটা নষ্ট মেয়েমানুষ—আমাদের ফাঁকি দেবার জন্যে ঐ অলপ্পেয়ে হরিচরণ ওকে দাদার মেয়ে সাজিয়ে এনেছে।

বনমালী। আরে না, না। তোর ভাজ যে দাদার উইল দেখেছে—দাদা নিজে হাতে লিখে গেছেন্‌, তাঁর একমাত্র মেয়ে ··

অন্নদা। বিয়ে করা পরিবারের কি না তা তুই কি করে জানলি?

বনমালী। সব কথা যে বলেছে ও ছোট বৌকে। বড় ভালো মেয়ে—কত কেঁদেছে। আহা, আপনার জন, কখনো দেখে নি কারুকে!

তারিণী। চুপ কর তুই আহম্মক কোথাকার! আপনার জন, হেন-তেন বলে স্বীকার করলে, শেষ পর্য্যন্ত ফাঁকে পড়বি বলে দিচ্ছি। উইল টুইলের কথা একদম ফাঁস করবি নে কারুর কাছে।

বনমালী। তার মানে? আমি ত ছোটবৌকে নিয়ে গিয়ে হরিবাবুর সঙ্গে মুকাবিলা করিয়ে দিয়েছি, ডলীকেও ত বলেছি। আহা, ওরা কত দুঃখ করলে শুনে, অভাবে পড়ে বেচারী ভুল করেছে। তাছাড়া তখন ত ও ডলীকে দেখেনি—অমন সুন্দর মেয়ে সে। হবে না, দাদার মেয়ে!

তারিণী। শুনলে মেজদা, গরুটার কাণ্ড শুনলে! ওরে গর্দ্দভ, তোকে এই ভালোমানষী করতে বললে কে?

অন্নদা। নীরেট কোথাকার! সব পণ্ড করলি তুই। ছি-ছি, এমন বলদ দেখেছে কেউ ভূ-ভারতে?

বনমালী। তা বৈ কি,·যার জিনিষ সে পাবে না, আর আমরা মজা করে তাই ভোগ-দখল করবো!

হেম। তবে মরো গে চিরকাল ঘুঁটে কুড়িয়ে। আজীবন বেড়ালে দরজায় দরজায় হাত পেতে—তাতেও সাধ মেটে নি?

বনমালী। হেম, তুই ত ছোট বোন। গরীব হলেও আমি তোর বড় ভাই—জেনে শুনে একটা অন্যায় হতে দিইনি বলে তুই আমায় যা-খুশী তাই বলছিস!

হেম। বলছি সাধে? নিজের হাতে তুমি আপন পায়ে কুড়ুল মারলে, সেই সঙ্গে আমাদেরও সর্ব্বনাশ করলে! হায়, হায়, আমার মাথা ফাটিয়ে মরতে ইচ্ছে করে--মুখের গরস মুখ থেকে পড়ে নষ্ট হল গো!

তারিণী। তুই ভয় পাসনে হেম, আমি থাকতে কার সাধ্যি দাদার সম্পত্তি থেকে আমাদের বঞ্চিত করে! ও-সব হরিচরণের বুজরুকি, আর এদের ন্যাকামিতে আমি ভুলছি না।

অন্নদা। বটেই ত!

[হরিচরণ ও ডলীর প্রবেশ]

হরিচরণ। এই হল আপনাদের দাদার মেয়ে। আলাপ করো মা, তোমার মেজোকাকা আর সেজোকাকা—ওঁকে ত আগেই দেখেছো, আর ইনি তোমাদের পিসিমা।

[প্রস্থান]

তারিণী। তা হ্যাঁ, তুমি কে বাছা? আমাদের দাদা ত ছিলেন চিরকুমার!

অন্নদা। তা তা তোমাকে আমরা কি করে তাঁর মেয়ে বলে...

হেম। তোমার চেহারা চাল-চলন কিছুই ত এ বংশের মতো নয় মা!

তারিণী। মানে দেখা নেই, শুনো নেই, চেনা নেই, পরিচয় নেই, হুট করে এসে দাঁড়ালেই ত আর মেয়ে বলে স্বীকার করে নেওয়া যায় না।

অন্নদা। কথাটা হচ্ছে গিয়ে, একটা সমাজ বলে জিনিষ আছে ত!

হেম। তা আবার নয়! হিঁদুর ঘরের কথা।

বনমালী। আঃ ও যে...

তারিণী। থাম বনমালী।

অন্নদা। তুই ত ভারী বুঝিস দুনিয়ার ব্যাপার স্যাপার!

ডলী। আপনারা বৃথা ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? আমি ত আপনাদের দাদার সম্পত্তি দখল করতে আসি নি।

তারিণী। তবে?

ডলী। আমি এসেছি বাবার শেষ কাজ করতে। তাঁর ছেলে বলতেও আমি, মেয়ে বলতেও আমি, ওটা আমাকেই করতে হবে—তারপর আমি যেখানে থেকে এসেছি, সেখানেই চলে যাবো। সবই আপনাদের থাকবে, আমি কিছুই নিয়ে যাবো না।

অন্নদা। আহা, তুমি ছেলেমানুষ, বোঝ না। সম্পত্তির কথা হচ্ছে না—দাদার সম্পত্তি যে পায় সে পাক, তা নিয়ে কিছু নয়। কিন্তু তুমি যে দাদার মেয়ে সেটা ত আমাদের জানতে হবে, নইলে কি করে তাঁর অন্তিম ক্রিয়া আমরা তোমাকে করতে দিই? একটা ধর্ম্ম বলে ত জিনিষ আছে।

ডলী। তার প্রমাণ আমি সঙ্গে করেই এনেছি। বাবা-মার বিয়ের রেজিষ্ট্রেরী দলিল আমার কাছেই আছে। কিন্তু তাতে দরকার নেই কিছু। আমি সবই শুনেছি খুড়ীমার কাছে—বাবা এখানে কি ভাবে ছিলেন, কি হয়ে মারা গেলেন, কে তাঁকে দেখাশুনো করেছিলেন, সবই। তারপর তিনি মরার পর কি হল, তাও সবই শুনেছি। তা এজন্যে আপনারা কেন এত কষ্ট করতে গেলেন? আপনাদের প্রাপ্য আপনারা নেবেন—এতে আর হাঙ্গামা কি?

তারিণী। তুমি যদি দাদার ধর্ম্মপত্নীর গর্ভজাত মেয়েই হও ত সবই তোমার—প্রমাণ দেখাও, দেখিয়ে নিয়ে নাও, এ ত সাফ কথা!

ডলী। দেখুন, ধর্ম্মপত্নীর সন্তানই আমি, সম্পত্তিও আমারই, কিন্তু তবু আমি নেব না, তার কারণ আমার মা'র নিষেধ আছে।

তারিণী। কিজন্যে?

ডলী। তাঁর সঙ্গে বাবা ভালো ব্যবহার করেন নি। তাঁকে বিয়ে করবার পরই তিনি আর একটি মেয়েকে ভালোবেসে ফেলেন, আর মাকে অনেক কষ্ট দিতে থাকেন। শেষকালে আমাকে আর মাকে ফেলে রেখেই চলে আসেন একদিন। বাবাকে বিয়ে করবার দরুণ মা'র আত্মীয়স্বজন সবাই পর হয়ে গেলেন—দিন চলে না আমাদের, অনেক দুঃখ করেই তিনি আমায় মানুষ করেন। তারপর আমি যখন মাষ্টারীতে ঢুকলাম, মা তখন মারা গেলেন—মৃত্যুকালে তিনি আমায় বলে গেছেন, আমি যেন বাবার মেয়ের কাজ করি, কিন্তু তাঁর এক কাণা-কড়িও যেন গ্রহণ না করি।

অন্নদা। হুঁ।

তারিণী। তা তোমার যখন মাতৃ-আজ্ঞা, কি আর করবে?

হেম। তাছাড়া ধর্ম্মের দিক থেকেও তোমার উচিত নয় কিছু নেওয়া। ও রকম বিয়ে ত বিয়ে নয়—তোমরা কি না কি জাত, আমরা হলাম বামুণ।

ডলী। আজ্ঞে, আমি ত বলেছি, আমি কিছু নেব না, আমি মাসে মাসে

যা পাই, তাতেই আমার বেশ চলে যায়। আমি হরিবাবুকে বলেছি, আপনাদের সকলের ভেতর সমান করে…

বনমালী। পাগল! দাদা নেই, তাঁর সম্পত্তি আমরা নেব? আমরা কি এতই…ও তোমার জিনিষ…

অন্নদা। বনা!

তারিণী। আদত গাধা!

বনমালী! ঘরের মেয়ে, দাদার মেয়ে, এ কি একটা কথা হল? চলো মা, চলো তুমি...হ্যাঁ! [উভয়ের প্রস্থান]

হেম। হাজার হলেও ভগবান আছেন ত!

অন্নদা। মেয়েটা মন্দ নয় দেখছি!

হেম। মন্দ নয়? দায়ে পড়ে বেটী সাধুপুরুষ সাজছে, বুঝতে পারছে ত যে দাবী প্রমাণ করতে পারবে না।

তারিণী। তা ছাড়া কি? যাকগে, হক্কের ধন, মারা গেল না তাই!

অন্নদা। আরে সবই ভগবানের হাত!

জয়-পরাজয়

[মধ্য কলিকাতার এক গৃহস্থ বাটী—বারান্দায়
দাঁড়িয়ে উপেন বাবু আর বিনয়।]

উপেন। হ্যাঁ, যা বলছিলাম। কারবারটা ইদানীং চলছিল জমি কেন-বেচার ওপর—যুদ্ধের হিড়িকে লোকে জমি-কেনা বন্ধ করে দিলে, সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলো টাকা গেল আটকা পড়ে। এই ফাঁকে ভেতরকার লোক ক'জন দিলে পাওনাদারদের উস্কে—তারা চারদিক থেকে হাঁ-হাঁ করে এসে ছেঁকে ধরলো।

বিনয়। তা ওটা ত লিমিটেড কোম্পানী ছিল?

উপেন। হ্যাঁ, প্রাইভেট লিমিটেড। মানে বুঝতেই পারছো, ছিল ক'জন শেয়ার-হোল্ডার—অল্পস্বল্প ইনভেষ্ট করে মোটা মোটা ডিভিডেণ্ট পিটছিল, যেই দেখলো অবস্থা কাহিল, অমনি যে যার শেয়ার সারেণ্ডার করে সরে পড়লো। আমি ছিলাম ম্যানেজিং ডিরেক্টার, সমস্ত ঝক্কি এসে পড়লো আমারি ঘাড়ে।

বিনয়। বুঝলাম। তা আপনার লায়েবিলিটি কত?

উপেন। সে অনেক। এসেট কত, লায়েবিলিটি কত, তার একটা ডিটেল্ড ডাইজেষ্ট করিয়েছি আমি—দেখাবো এখন তোমাকে।

বিনয়। মানে আমি বলছিলাম, কত টাকা হলে আপনি আপাতত ক্রাইসিসটা ঠেকাতে পারেন?

উপেন। হাজার বিশেক ত বটেই। তাহলে সকলকেই কিছু কিছু দিয়ে আবার সময় নিতে পারি। আনরিয়ালাইজড বিল ত কম নেই বাজারে—উঠে-পড়ে লাগলে, ছ'মাসের মধ্যে ধার-দেনা মিটিয়ে হয়ত আবার কারবার গুছিয়ে নিতেও পারবো।

বিনয়। এই টাকাটা জোগাড় করতে পারবেন না কোন রকমে?

উপেন। পারা কঠিন। একে ত যুদ্ধ—তার ওপর হঠাৎ বিজিনেসে রাণ হওয়ার মতো হয়েছে, এখন বিশ্বাস করে টাকা ছাড়তে চায় কি কেউ?

পার্টিস-এর কাছে অল্প কিছু সময় নিয়েছি—চেষ্টাও করছি প্রাণপণ, কিন্তু সুবিধে করতে পারলাম কৈ ?

বিনয়। তাই ত!

উপেন। যা দেখছি, শেষ পর্য্যন্ত ব্যবসা লিকুইডেশনেই যাবে। মধ্যে থেকে বিপদ করেছি কি জানো ? নিজের যা পুঁজিপাটা ছিল, সবই দিয়েছি পাওনাদারদের—তা-ও গেল, কারবারও বাঁচলো না। বুড়ো বয়সে একেবারেই, পথে বসতে হল দেখছি!

বিনয়। অত ভাববেন না কাকাবাবু। আমরা পাচজন থাকতে এই টাকাটা কি আর সংগ্রহ হবে না ? দেখছি আমি!

উপেন। দেখো বাবা, যদি কিছু করতে পারো! তুমি গবুর বন্ধু, ছোট্ট বেলা থেকে আসো-যাও, ছেলের মতোই মনে করি তোমাকে। তোমার কাকীমা ত বিনয় বলতেই অজ্ঞান। মেয়েটা অসময়ে বিধবা হয়ে ফিরে এলো তুমি তাকে শিক্ষা দিয়ে, উপদেশ দিয়ে, সৎপথে চালাবার ভার নিলে—আমরা কতই না বল-ভরসা পেলাম!

বিনয়। এ আর বেশী কথা কি কাকাবাবু ? আমার আপন বোনেরই যদি এই হত! গৌরীকে আমি তার চেয়ে কম মনে করি না।

উপেন। সে আমি জানি। তাই ত তোমার সঙ্গে ও মেলে-মেশে, এখানে-সেখানে যায়, তাতে আমি এতটুকু আপত্তি করি নে। তোমার কাকীমাকে বরং এই কথাই বলি যে বিনয় একটা সত্যিকার মহৎ ছেলে।

বিনয়। লজ্জা দেবেন না কাকাবাবু। তা হ্যাঁ, হাজার কুড়ি টাকা আমার নিজেরই আছে। সেটা আপনাকে আমি দিতে পারবো দিন কয়েকের মধ্যেই।

উপেন। তাহলেই হবে। বলেছি ত কিছু সময় আছে আমার হাতে।

বিনয়। আচ্ছা। এই দিয়ে আপনি আপাতত হাঙ্গামটা ত মেটান, তারপর ...

উপেন। সে আর বলতে হবে না, তিনমাসের ভেতরই আমি তোমার টাকা উইথ ইণ্টারেষ্ট...

বিনয়। ছি-ছি, কি বলছেন কাকাবাবু ? আমি কি আপনার সঙ্গে লগ্নি-কারবার করছি ? বাবা কিছু টাকা রেখে গেছেন—পড়েই আছে ব্যাঙ্কে। আপনার বিপদের সময় নাহয়...

উপেন। দেখো বাবা, আমি ত একেবারেই হাল ছেড়ে দিয়েছিলাম। যদি তুমি ঠেকাতে পারো, তাহলে আমার শুধু মানই রক্ষা হয় না, প্রাণও বাঁচে। তা একটা ফর্ম্মাল লেখাপড়া...

বিনয়। লেখাপড়া কি হবে কাকাবাবু? আপনিও পালাচ্ছেন না, আমিও পালাচ্ছি নে—মুখের কথাই ঢের!

উপেন। তাহলেও টাকা জিনিষ, বড় মন্দ জিনিষ বাবা। আর বয়সও হয়েছে, কবে বলতে কবে মরেও যেতে পারি—একটা দলিল-দস্তাবেজ থাকলে ...

বিনয়। রামো, রামো। আমি জানি, আপনাদের কাছে আমিও যা, গবুও তাই।

উপেন। একশো বার। গবুর চেয়েও তুমি বেশী—আপন ছেলে হলে হবে কি? সত্যি কথা ত বলতে হবে—সে আমার একটা কথা শোনে না! আচ্ছা থাক, তুমি যখন বলছো।

বিনয়। আচ্ছা কাকাবাবু, তাহলে ঐ কথাই রইলো। আমি এখন একটু ক্যারম খেলি গে।

উপেন। আচ্ছা। আর হ্যাঁ, কথাটা যেন শুধু তোমার-আমার মধ্যেই থাকে বাবা। মানে একটা মান-সম্ভ্রম...বুঝতেই ত পারো।

বিনয়। নিশ্চয়, নিশ্চয়। [প্রস্থান]

উপেন। বনমালী! [বনমালীর প্রবেশ] এই কাগজপত্রগুলো দেরাজে তোল। আর বাড়ীতে বলিস, আমি একটু বেরুচ্ছি, ফিরতে হয়ত বারোটা-একটা হবে।

[প্রস্থান। বনমালী ফাইল গুছাতে লাগলো, ইতিমধ্যে ঘরে এসে ঢুকলেন সুরবালা।]

সুরবালা। বাবু কোথায় রে?

বনমালী। বাবু বেরিয়ে গেলেন। বলে গেলেন, ফিরতে বারোটা-একটা হবে।

সুরবালা। কোথায় আবার গেলেন এত বেলায়? নাওয়া-খাওয়া হয় নি!

বনমালী। তা ত জানি নে মা।

সুরবালা। হ্যাঁ শোন, তুই ঋষির দোকানে গিয়ে বলে আয় ত যেন বিকেলের দিকে আমার সঙ্গে একবার দেখা করে সে। হিসেবে অনেক গোলমাল করেছে।

বনমালী। যাচ্ছি মা।

[প্রস্থান। নিস্তারিণী সবেগে ঘরে এসে ঢুকলেন।]

নিস্তারিণী। এ সব কি কাণ্ড মা তোমাদের বাড়ীতে? একাদশীর দিনে সোমত্ত বিধবা মেয়ে বড় ভাইয়ের বন্ধুর সঙ্গে সমান হয়ে বসে চা খাচ্ছে! এ কি হিঁদুর বাড়ী, না যবন-খেষ্টানের বাড়ী? ছি-ছি!

সুরবালা। আস্তে বলো মা, শুনতে পাবে শেষটা!

নিস্তারিণী। পেলেই বা, অত ভয়টা কিসের শুনি? সোমত্ত মেয়ে, সবে সেদিন সোয়ামি মরেছে—কোথায় মনের ঘেন্নায় মরে থাকবে, তা না রাজ্যের বেটা ছেলের সঙ্গে হৈ-হৈ করে বেড়াচ্ছে, কোথায় যাচ্ছে, কি করছে, তার ঠিক নেই! মরুক গে যাক, চোখের আড়ালে যা করছে তা করছে, শেষটা নাকের ডগায় বসে একাদশীর দিনে খেতে আরম্ভ করলে! কি ঘেন্না!

সুরবালা। দিনকাল বদলেছে মা। এখনকার লোক বলে, ওতে কোন দোষ নেই।

নিস্তারিণী। তারা না হয় পাগল হয়েছে, তুই ত আর পাগল হস নি! কি বলে তুই ঐ রাঁড় মেয়েকে একটা জোয়ান-মদ্দ মিনসের সঙ্গে একলা পথে-ঘাটে যেতে দিস? কি বলে তাকে যা-খুসী তাই খেতে, যা-খুসী তাই পরতে দিস?

সুরবালা। না হলে গবু যে কুরুক্ষেত্র-কাণ্ড করে! বলে, ওকে ত বাঁচতে হবে—কি নিয়ে বাঁচবে ও? গরীব-দুঃখীর সেবা করুক, পড়াশুনা করুক, খাক-পরুক—ওর বয়সটাই বা কি? আর বিনয়কে ত ও দেবতা বলেই মনে করে!

নিস্তারিণী। গবা আবার একটা মানুষ! নইলে লেখাপড়া শিখেছে, বিয়ে করলে না, খাওয়া করলে না, একটা পয়সা রোজগার করলে না—খালি দিনরাত্তির মেতে আছে হৈ-হৈ নিয়ে—কোথায় বন্যা হল, কোথায় কার মেয়ে চুরি হল। আর সঙ্গীও জুটেছে তেমি! গোল্লায় যাবে তোমার সংসার...এই আমি বলে রাখলাম সুরো।

সুরবালা। যাক গে, চুপ করো মা। বাড়ীর মালিকই রয়েছেন, তিনি যখন কিছু বলছেন না, তখন আমাদের কথায় কাজ কি ?

নিস্তারিণী। তার সময় আছে এ-দিকে চোখে দেবার ? পুরুষ মানুষ, টাকা কামাবে, না ঘর সামলাবে ? কিন্তু গিন্নীকে ত শক্ত হতে হয় ! মেয়েমানুষ—ও হল মাটির ভাঁড়, অন্যে ছুঁলো কি ফেলা গেল !

সুরবালা। শক্ত হবো কোথা থেকে ? কর্ত্তা ঐ রকম—আমি মেয়েমানুষ, কে শুনছে আমার কথা ?

নিস্তারিণী। এই আমি বলে রাখছি সুরো, যে-রকম ব্যাপার-স্যাপার চলছে, তাতে মেয়ে তোমার কুকীর্ত্তি করে বসবেই একদিন। হয় ঐ ছোঁড়ার সঙ্গে পালাবে, নয়ত ঘরে বসেই...

সুরবালা। আঃ, কি করছো মা ? ও-সব কথা বলে মানুষে ?

নিস্তারিণী। বলবো না ? আমি কারুর খাই, না পরি, তাই ভয় করে চলবো ?

[ঐ বাড়ীর দোতলার ঘর—গৌরী ও বিনয়।]

গৌরী। না বিনয়দা, বাবাকে তুমি টাকা দিও না।

বিনয়। কেন ?

গৌরী। আসল কথা তোমাকে বলি—বাবার কারবার নেই, ফেল হয়ে গেছে।

বিনয়। তবে যে তিনি বললেন, কিছু টাকা হলে আপাতত ...

গৌরী। সে তোমাকে ঠকাবার জন্যে।

বিনয়। সে কি ? তাই কখনো হয় ? এতদিনের জানা-শোনা !

গৌরী। তোমার চেয়ে ঢের বেশী দিনের জানা-শোনা ছিল প্রমথবাবু, হেমন্তবাবু, গিরীনবাবু—এঁদের সঙ্গে। বাবা তাঁদের পথে বসিয়েছেন !

বিনয়। কি রকম ?

গৌরী। ওঁদের সঙ্গেই শেয়ারে বাবা কারবার করেছিলেন। তারপর কারবার ফেল করিয়ে দিয়ে তাঁদের হঠালেন, আর সমস্ত টাকা নিজে নিয়ে নিলেন।

বিনয়। বলো কি? নিলেন কি করে?

গৌরী। অল্প কিছু টাকা দিলেন জমির স্পেকুলেশনে লাগিয়ে—আর তলায় তলায় বাকী টাকা সরিয়ে ফেললেন। এদিকে কেনা জমির একটিও বিক্রি হল না, কারবার কাবু হয়ে পড়লো, তখন কৌশলে দিলেন পাওনাদার গুলোকে লেলিয়ে—তারপর বুঝতেই পারছো।

বিনয়। বুঝলাম। তা শেয়ার-হোল্ডাররা কেউ কিছু করতে পারলো না তাঁর?

গৌরী। করবে কি করে? টাকা ত জমা হয়েছে মা'র নামে—বাবা ত ধরা-ছোঁয়ার রাস্তা রাখেন নি কিছু।

বিনয়। আচ্ছা, সে টাকা এখন কোথায়?

গৌরী। ব্যাঙ্কে—মা'র নামে সুদ বাড়ছে।

বিনয়। যাক, তাহলে তুমি সবটা জানো না দেখছি!

গৌরী। তার মানে?

বিনয়। তার মানে, তোমার বাবার ফাঁকি-দিয়ে-পাওয়া সেই টাকা আবার আর একজন তোমার মা'র কাছ থেকে ফাঁকি দিয়ে নিয়েছে।

গৌরী। সে কি! সত্যি?

বিনয়। হ্যাঁ, দু'দিন পরেই জানতে পারবে। যাক গে, ও-সব কথা থাক।

গৌরী। না, না, বলো না শুনি।

বিনয়। সে টাকা নিয়েছি আমি।

গৌরী। তুমি?

বিনয়। হ্যাঁ আমি।

গৌরী। কি করে নিলে?

বিনয়। তোমার মাকে ঠকিয়ে।

গৌরী। বাবা জানেন না, দাদা জানে না?

বিনয়। কেউ জানে না তোমার মা ছাড়া। শুধু তুমি জানলে।

গৌরী। যাঃ, চালাকি করছো!

বিনয়। চালাকি নয় গৌরী, সত্যি বলছি। তোমার মা'র একটা দুর্ব্বলতার সুযোগ সমস্ত টাকা আমি আত্মসাৎ করে নিয়েছি। কেন, অবাক হচ্ছো?

গৌরী। নিশ্চয় হচ্ছি। তুমি—তুমি পরের টাকা ফাঁকি দিয়ে নেবে—এ যে চোখে দেখলেও আমি বিশ্বাস করতে পারি না!

বিনয়। কেন আমায় কি তুমি দেবতা মনে করো?

গৌরী। এতদিন তাই করেছি। যে লোক নিজের গায়ের জামা খুলে ভিখিরি ছেলের গা ঢেকে দেয়, দিনের পর দিন কুলি বস্তিতে পড়ে থাকে তাদের রোগে শুশ্রূষা করার জন্যে, নিজের জীবন বিপন্ন করে যে ঝাঁপ দেয় বন্যার মুখে, নয়ত আগুনের ভেতর—সে লোক পরের টাকা চুরি করেছে, এ কি সম্ভব? নিজের টাকাই যে বিলিয়ে দিলে পরের জন্যে, পরের টাকায় তার লোভ থাকতে পারে?

বিনয়। খুব পারে গৌরী। মানুষ একই সঙ্গে দেবতা, আবার পশুও। একটা দিকের পরিচয় এতদিন পেয়েছো, এবার পেলে আর একটা দিকের। এতদিনে তোমার কাছে সম্পূর্ণ হল আমার পরিচয়।

গৌরী। না, না, এ হতেই পারে না। তুমি আমাকে মিথ্যে ভয় দেখাচ্ছো।

বিনয়। ভয়? মোটেই না গৌরী, তোমাকে আমি খাঁটি কথাই বলছি। গোটা দুনিয়াই চলছে বুদ্ধির মার-প্যাঁচে—তোমার বাবা বুদ্ধি খাটিয়ে অন্যদের ঠকিয়েছেন, এখন চেষ্টা করছেন আমাকে ঠকাতে, আমিও বুদ্ধির কৌশলেই ঠকিয়েছি তোমাদের—এতে আশ্চর্য্যের কি আছে?

গৌরী। তাহলে—তা হলে—যাক গে, তুমি তাহলে বাবাকে আর টাকা দেবে না?

বিনয়। নিশ্চয় দোব।

গৌরী। হেঁয়ালী হয়ে পড়েছ বিনয়দা। যে-লোক আমার মাকে ফাঁকি দিয়ে সর্ব্বস্ব হাত করেছে, সে আবার আমার বাবাকে ফেরত পাবে না জেনেই টাকা দেবে...

বিনয়। ঐ ত বললাম গৌরী, মানুষ একই সঙ্গে দুই—দেবতা আর পশু। পশুটা করেছে প্রতারণা, এবার দেবতা করবে দয়া।

গৌরী। কিন্তু আমি, আমি তোমাকে...

বিনয়। ভুল জানতে গৌরী। যাকগে, এখন আমি চললাম, তোমার বাবার টাকাটার ব্যবস্থা করতে হবে।

[প্রস্থান]

[গোবিন্দের প্রবেশ]

গোবিন্দ। বিনয় চলে গেছে রে?

গৌরী। হ্যাঁ, এই ত গেল।

গোবিন্দ। ওঃ, আচ্ছা যাক।

গৌরী। কেন দরকার ছিল কিছু?

গোবিন্দ। ছিল। আচ্ছা হবে, বিকেলে আসছেই ত আবার।

গৌরী। আচ্ছা দাদা, বাবা বিশ হাজার টাকা ধার নিচ্ছেন বিনয়দার কাছ থেকে?

গোবিন্দ। হ্যাঁ।

গৌরী। ও-টাকা বাবা আর ফেরত দেবেন না তা জানো?

গোবিন্দ। জানি বৈকি।

গৌরী। তবে জেনে-শুনে আপন বন্ধুকে এ-রকম বিপদে ফেলতে যাচ্ছো কেন?

গোবিন্দ। একজনকে বিপদে না ফেললে, আর একজনের সম্পদ হয় কখনো?

গৌরী। এ শিক্ষা ত এর আগে কোন দিন দাওনি দাদা।

গোবিন্দ। ধীরে ধীরেই শিখতে হয় সব জিনিস। তা বিনয়কে তুই দিতে বারণ করিস নি ত? দেখ, তাহলে কিন্তু আমাদের সমস্ত প্ল্যানই ভণ্ডুল হয়ে যাবে!

গৌরী। আমি কিছু বলি নি। কিন্তু সে কি আর এতই বোকা যে তোমাদের কৌশল ধরতে পারে নি?

গোবিন্দ। বোধহয় পারে নি। বাবার ধারণা, ও একটা মোহের ভেতর রয়েছে—এখন ওকে চাপ দিলেই টাকা বেরুবে, ও আগু-পিছু ভেবে দেখবে না।

গৌরী। তার মানে?

গোবিন্দ। বুঝতে চেষ্টা কর।

গৌরী। বুঝেছি দাদা। কিন্তু তোমারও কি এই ধারণা?

গোবিন্দ। অনেকটা।

গৌরী। ছি-ছি, এই যদি তোমাদের মনের কথা, তাহলে আমাকে কি

বিনয়দার সঙ্গে মিশতে দিয়েছো, শুধু সেই সুযোগে তার ঘাড় ভাঙবে বলে? আমি কি তোমাদের ব্যবসা চলানোর সওদা? নিজের বোনকে নিয়ে...

গোবিন্দ। দূর পাগলী, এত সিরিয়াসলি নিস কেন? একটা কৌশল হচ্ছে মাত্র। তারপর কাজ বাগিয়ে নিয়ে দোব অর্দ্ধচন্দ্র দিয়ে বিদেয় করে—ক্ষতি কিছুই নেই, মধ্যে থেকে মোটা দাঁও!

গৌরী। কিন্তু দাদা, এই মেলামেশার দরুণ আমার মনে যদি দুর্ব্বলতা জন্মে থাকে!

গোবিন্দ। তার ওপরে উঠতে হবে। তারি নাম ত প্র্যাকটিক্যাল বুদ্ধি! অত সেন্টিমেণ্টাল হবি কি জন্যে?

গৌরী। না দাদা, এতকাল পরে আজ যেন আর তোমাদের চিনতে পারছিনে। ছেলেবেলা থেকে দেখেছি, তোমাদের দু'জনে হরিহরাত্মা ভাব—দু'জনকেই জীবনের পথে চলতে দেখেছি, খুব উঁচু আদর্শ নিয়ে—সেই দু'জনই

গোবিন্দ। কেন বিনয় কি করলে?

গৌরী। কি করেছে সে তার পরিচয়ও একদিন পাবে।

গোবিন্দ। কি তবু শুনি না!

গৌরী। থাক দাদা, আমাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করো না, আমার সমস্ত বুক তোলপাড় হচ্ছে—যে লক্ষ্য ধরে চলছিলাম, হঠাৎ তা চোখের সামনেই ভেঙে চুরমার হয়ে গেল, এরপর আমার আর নির্ভর করার জায়গা কোথায়?

গোবিন্দ। যাঃ, তুই একেবারেই মানুষ হস নি—কেঁদেই খুন হলি। দেখ ত আমি কি করি শেষ পর্য্যন্ত!

[নিস্তারিণীর প্রবেশ]

নিস্তারিণী। ভাইবোনে ত খুব আমোদেই আছো, ওদিকে মা বেটী যে মরছে কেঁদে-কেটে, সে হুঁস আছে তোমাদের? এত বড় ছেলে, আর এতখানি ধুম্বো মেয়ে—তোমাদের না আছে লজ্জা, না আছে আক্কেল!

গোবিন্দ। কি হয়েছে কি? মা কাঁদছে কেন?

নিস্তারিণী। কাঁদবে না? খিটকেলের আর বাকী আছে কিছু? সোমত্ত বিধবা মেয়ে, নিষ্ঠা নেই, কাষ্ঠা নেই—একটা নিপর বেটাছেলের সঙ্গে বসে ফটো তুলিয়েছো—কোন ভদ্রলোকের মেয়ে এরপর না কেঁদে থাকতে পারে?

গোবিন্দ। যা গৌরী তুই এখান থেকে। [গৌরীর প্রস্থান] দেখো দিদিমা, তোমাদের আমল আর আমাদের আমলের মাঝখানে পঞ্চাশ বছরের ফারাক—এই সময়ের ভেতর দুনিয়ার কিছু অদল-বদল হয়েছে বলে মনে করো?

নিস্তারিণী। হয়েছে বৈ কি—বিধবা বোনকে আপন ভাইয়ে দিচ্ছে পরের হাতে তুলে, আর মায়ে-বাপে বসে বসে তাই দেখছে! মা গো, এমন ঘরেও মেয়ে দিয়েছিলাম! শেষটা বোনের বিয়ে না দিস তোরা!

গোবিন্দ। দরকার হলেই দোব দিদিমা।

[ঐ বাড়ীর অন্দর—উপেন্দ্রবাবু ও সুরবালা]

উপেন। আমাকে কেন বলো নি? লেখা নেই, পড়া নেই, সরাসরি এতগুলো টাকা কি বলে তুলে দিলে পরের হাতে?

সুরবালা। লোভে পড়ে। বললে, ভিনদেশী লোকেরা নতুন নতুন মোটরকার বিক্রি করে যাচ্ছে সস্তায়—সেগুলো কিনে ডবল দামে বিক্রি করা যায়—কি মন হল, দিয়ে বসলাম।

উপেন। বেশ করলে! এখন বেড়াও সাতগুষ্টি পথে-পথে ভিক্ষে করে! দু'হাজার টাকার পুঁজি নিয়ে যা কামিয়ে দিয়েছিলাম, তাতে তিন পুরুষ সুখে-স্বচ্ছন্দে কাটাতে পারতো। সাড়ে তিন লক্ষ টাকা···ইস!

সুরবালা। ও যে এমন নেমকহারামী করবে, তা আর কেমন করে জানবো? এতটুকু বেলা থেকে জানি—ঘরের ছেলের মতো! বললে, কাকীমা, এক কোটি দেড় কোটি টাকা আমি নির্ঘাত তুলে আনবো, তারপর আধাআধি নোব ভাগ করে—বিশ্বাস করলাম!

উপেন। তা করবে না কেন? পয়সা যাদের রোজগার করতে হয়, তারাই জানে এক কোটি টাকা কাকে বলে! সারা জীবন ব্যবসা নিয়ে কাটালাম, আমার একটা পরামর্শ পর্যন্ত নেওয়ার দরকার হল না তোমার? শনি ঘাড়ে চাপলে আর হবে কি করে? আর ঐ উল্লুক গবাটা, ওটাকে জুতো মেরে তাড়াতে হয় বাড়ী থেকে, একটা দুষমন এনে জুটিয়েছিল—আমায় পথের ভিখারী করে তবে ছাড়লে!

সুরবালা। পাপের ধন, তাই থাকলো না। পাঁচ জনের বুক ভেঙে দীর্ঘনিশ্বাস পড়েছে, ও-টাকা কখনো রক্ষে হয়?

উপেন। থামো, থামো, পাপের ধন? কোন শালার ধন পাপের নয়

শুনি? এই যে বাঁদীর বাচ্ছা তোমার কান মলে সর্ব্বস্ব নিয়ে গেল, এ কি পুণ্যির ধন হল? দেখো, এর পর ও চার-মহলা বাড়ী হাঁকাবে, আর তোমার পুত্তুর যাবে নারকেলের মালা হাতে করে সেখানে ভিক্ষে করতে, তোমার মেয়ে যাবে ওর বাড়ী বাসন মাজতে!

সুরবালা। কপালে থাকলে কেউ খণ্ডাতে পারে?

উপেন। কপাল? যাদের কোন যোগ্যতা নেই, তারাই বলে কপাল। মানুষ নিজের কপাল নিজেই তৈরি করে নেয়। এই যে আমি—আমার না ছিল চাল, না ছিল চুলো, আমি কপাল ফেরাই নি? তোমরা পাঁচ ভূত জুটেই আমায় বুড়ো বয়সে পথে বসালে!

সুরবালা। আমরাও ত বসলাম সেই সঙ্গে—তার আর বকে কি হবে?

উপেন। আমি কোথায় ভাবছিলাম, ছোঁড়াটা ফাঁদে পড়েছে, এই সুযোগে দুয়ে নিই যা পারি, তারপর দুই লাথি মেরে ভাগালেই চলবে—তা না, আমারি সর্ব্বস্ব নিয়ে সে দিলে চম্পট! আপন হাত আমার আপনি কামড়াতে ইচ্ছে করছে—একেই বলে স্ত্রীবুদ্ধি!

[গোবিন্দর প্রবেশ]

গোবিন্দ। কি হয়েছে বাবা? বকাবকি করছো কেন?

উপেন। হয়েছে আমার মুণ্ডু! তলায় তলায় ফিকির করে বিনয় ব্যাটা তোমার মা'র হাত থেকে সর্ব্বস্ব নিয়ে হাওয়া হয়েছে। এখন বেড়াও সবাই ঝিঙে চেঁছে। এই বয়সে আর ত আমার ক্ষমতা নেই যে নতুন করে পয়সা এনে দেব!

গোবিন্দ। গিয়েছে যাকগে, ও নিয়ে আর দাপাদাপি করে কি হবে?

উপেন। খাবে কি বাপের মাথা? কাণাকড়িটিও ত পুঁজি নেই!

গোবিন্দ। সে ত প্রমথবাবু, গিরীনবাবুদেরও নেই। তাঁদের মতো করেই না হয় চলবে আমাদেরও।

উপেন। তবে চলুক। আমার আর ক'দিন? আমি ত পা বাড়িয়েই আছি। তোমরাই মরবে দুয়োরে দুয়োরে হাত পেতে। চেষ্টা করেছিলাম ভালো করবার, কিন্তু যাদের বরাতে আছে ঘুঁটে কুড়ানো, তাদের ভালো কে করতে পারে?

গোবিন্দ। এতগুলি লোকের সর্ব্বনাশ করে যে ভালো করেছিলে একা

আমার জন্যে, সে ভালো যে টিঁকলো না শেষ পর্যন্ত, এতে আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করেছি বাবা!

উপেন। বটে? যার জন্যে চুরি করি, সেই বলে চোর!

গোবিন্দ। তা হ্যাঁ শোনো বাবা, মা'র টাকা বিনয় নিজের জন্যে চুরি করেনি, করেছে আমারি জন্যে।

উপেন। কেন, তর সইছিল না আমি মরা পর্যন্ত?

সুরবালা। অ্যাঁ! তুই?

গোবিন্দ। হ্যাঁ আমিই। আমিই ফন্দী দিই বিনয়কে, কৌশলে তোমার কাছ থেকে টাকাটা বের করে আনতে।

উপেন। তারপর কি হয়েছে সে টাকায়?

গোবিন্দ। সব ক'জন শেয়ার-হোল্ডারকে সমানভাবে ভাগ করে দিয়েছি। তুমিও এক ভাগ পেয়েছো। তোমার পাওনাদাররাও কেউ ফাঁকে পড়ে নি।

উপেন। এ তোমাকে করতে বলেছিল কে?

গোবিন্দ। বলেছিল বিবেক। বাবা হয়ে তুমি যে অধর্ম্মের ইমারত খাড়া করে তুলেছিলে, ছেলে হয়ে আমি তার তলা ধ্বসিয়ে দিয়েছি, তোমার আত্মাকে বাঁচাবার জন্যে। তা তুমি বাবা দুঃখ করো না, বিনয়ের কাছ থেকে তুমি বিশহাজার টাকা আদায় করবার চেষ্টা করছিলে—তার চেয়ে অনেক অনেক বেশীই তোমার প্রাপ্য হয়েছে।

উপেন। কত?

গোবিন্দ। প্রায় সত্তর হাজার—এই কি যথেষ্ট নয়? এত টাকাই বা ক'জনের আছে এদেশে?

উপেন। সে ত অনেকের এক বেলার ভাতও নেই!

গোবিন্দ। নেইই ত বাবা। অথচ তাদের যে কোন অপরাধ আছে, তা ত নয়! এই রকম করে একজনে পাঁচজনের পুঁজি কেড়ে নিয়ে যখন ফেঁপে ওঠে, তখন যারা ফাঁকে পড়ে, তাদের ছেলেপুলে বিনা দোষেই ত ভিখারী হয়—সে অন্যায় থেকে আমাদের হাত পরিষ্কার করে ফেলতে হয়েছে বাবা!

সুরবালা। তা বেশ করেছিস গবু। আমার দিনরাত্তির বুক গুর গুর করতো—কি হয়, কি হয়! এখন নিশ্চিন্দি হলাম!

অধ্যাপক

[ডাঃ সোমের বাড়ীর অন্দর। আন্নাকালী ও সুজাতা।]

সুজাতা। তোমায় চিঠি পেয়ে আমি ত অবাক! সত্যি বলছি মা, প্রথমটা আমার বিশ্বাসই হয় নি। তাই ওঁকে বললাম, আগে ব্যাপার-স্যাপার কি জেনে এসো।

আন্নাকালী। বিশ্বাস কি আমিই করতে পেরেছিলাম প্রথমে? তোদের সঙ্গে পড়েছে, ছোট বেলা থেকে আসে-যায়—মেয়ের মতোই মনে করেছি। ওর যে মতিগতি এমন হবে, এ আর কি করে ভাববো?

সুজাতা। ছি-ছি, কি ঘেন্না! বাবার কি বুড়ো বয়সে ভীমরতি হয়েছে? এত বড় বিদ্বান, দেশে-বিদেশে এত নাম, ছি-ছি!

আন্নাকালী। কি আর বলবো তোদের কাছে? চিরদিনই ঐ রকম। আমি কি কম যন্ত্রণা সহ্য করেছি আজীবন? এতকাল মুখ বুঁজে কাটিয়েছি—এখন দিন হয়ে এসেছে, আর পারছিনে। তাছাড়া শুধু ত এই নয়, ওকে যে সর্ব্বস্ব হাতে তুলে দিয়ে যাবার ফন্দী করেছে!

সুজাতা। সেই জন্যেই ত বেশী ভাবনা মা। তাই ত তোমার জামাইকে বললাম একটা কোন বিহিত করতে। উনি কি বলেন জানো? উনি বলেন যে ওকে যেমন করে হক, বাবার চোখ-ছাড়া করতেই হবে—যাতে ও অন্য লোকের পাল্লায় পড়ে, নয়ত একটা দুষ্কাজ করে—এ না হলে ত বাবার নেশা ছুটবে না!

আন্নাকালী। যা ভালো বুঝিস কর তোরা। সেইজন্যেই ত তোদের আনিয়েছি। আমার নীপু যেন শেষকালটা পথে না বসে!

সুজাতা। সত্যি, কি আশ্চর্য্য! মেয়ের ক্লাস-ফ্রেণ্ড, তার ওপর ঐ ত গণ্ডারের মতো রূপ—কি দেখে ওকে পছন্দ হল বাবার?

আন্নাকালী। সোমত্ত মাগী ত—হবে না কেন? ছ্যাঁচড়া পুরুষ মানুষ যারা হয়, তারা কি আর রূপ-গুণ দেখে? তারা দেখে গতর—তার ত অভাব নেই।

সুজাতা। ওকেও বলি—তুই বাপু এম-এ পাশ করেছিস, মাষ্টারী টাষ্টারী করছিস, মনের মতন দেখে শুনে একটা বিয়ে কর, নয়ত অধঃপাতেই যদি যাবি ত সেই রকম একটা লোক খুঁজে নে। তা না বাপের বয়সী এক বুড়োর সঙ্গে ··

আন্নাকালী। ওরে ও কি আর বুড়োকে দেখে মজেছে, না ভালোবেসেছে ? ওর নজর রয়েছে বুড়োর ব্যাঙ্কের টাকার দিকে, বাড়ী-ঘরের দিকে—জানছে ত বুড়ো দু'দিন পরেই পটল তুলবে, তখন এই সমস্ত হাতিয়ে নিয়ে দিব্যি জমিদারিণী হয়ে বসবে, আর যা-খুসী তাই করতে থাকবে। তখন মনের মতন মানুষেরও অভাব হবে না।

সুজাতা। কি সেয়ানা মা! আমি ওকে চিরদিন ন্যাকা মনে করে এসেছি—পরীক্ষা পাশ করবে, চাকরী করে দু পয়সা রোজগার করবে, বড় জোর একটা কলেজের মেয়েকে খাওয়া-পরা দিয়ে পুষবে, এ ছাড়া আর যে কিছু ওর ক্ষমতায় কুলোবে, তা স্বপ্নেও ভাবি নি। বরাবরই ও বলেছে, বিয়ে করবো না—সে হল মুখের কথা, আসলে ও জানতো যে এমন কোন ভদ্রলোক নেই, যে ঐ চীজকে বৌ করবে!

আন্নাকালী। গোড়ায় আমারি ভুল হয়েছে। যখন তোদের বিয়ে-থাওয়া হয়ে গেল, তোরা শ্বশুরবাড়ী চলে গেলি, তখনি ওকে আর বাড়ীতে না ঢুকতে দেওয়া উচিত ছিল। ভেবেছিলাম, মেয়েটা লেখাপড়া করেছে, কাজ-কম্মে সাহায্য করে—মরুক গে, আসছে আসুক। তলায় তলায় যে দু'জনে এই কাণ্ড করবে, এ আমার মাথায় আসে নি।

সুজাতা। আসা ত সম্ভব নয়। তা হ্যাঁ, বাবা কি বলেন এ সম্বন্ধে ?

আন্নাকালী। কে জিজ্ঞেস করতে গেছে ? নিজের চোখে সবি দেখলাম যেদিন, সেদিন থেকেই মুখ-দেখাদেখি বন্ধ করে দিয়েছি। একদিন নীপুকে বললাম—ও ত আবার তেমনি ছেলে, বলা নেই, কওয়া নেই, ধাঁ করে গিয়ে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বসলো!

সুজাতা। কাকে বাবাকে ?

আন্নাকালী। না রে না, লুসিকে। আর সেই থেকেই ওর ওপর হল বিষ-দৃষ্টি—কিচ্ছু দোব না ওকে, ওকে ত্যাজ্যপুত্র করবো!

সুজাতা। আমি যে শুনলাম, নীপু বাবাকে মেরেছে!

আন্নাকালী। কি জানি বাপু, সে আমি বলতে পারি নে। বকাবকি হয়েছিল একদিন—সেই কথাই পাঁচজনে ডালে-পল্লবে সাজিয়ে রটনা করেছে হয়ত। আর মেরে থাকলেই বা দোষের কি করেছে? বাপ যদি কারুর পাগল হয়, তাহলে তার পাগলামি ছোটাতে হবে বৈকি!

[অঞ্জলির প্রবেশ]

অঞ্জলি। দেখে এলাম সব।

সুজাতা। কি দেখলি?

অঞ্জলি। বাবা একটা কৌচে বসে কি যেন পড়ছে, আর লুসিদি তার উরতের ওপর দুটো কনুইয়ে ভর দিয়ে বসে আছে একটা মোড়াতে।

সুজাতা। বাবা বাড়ী আছে? আমি যে শুনলাম, কোথায় গেছে!

অঞ্জলি। আছে বৈকি। ও-সব শেখানো কথা!

আন্নাকালী। আর কি করছে রে?

অঞ্জলি। আর বাপু কিছু দেখি নি। বাবা মাঝে মাঝে ওর পিঠে হাত দিচ্ছে—এই পর্যান্ত।

আন্নাকালী। দেখলি জাঁতি, দেখলি ত! বল এবার কি করা উচিত?

সুজাতা। দাঁড়াও, দাঁড়াও, তোমার জামাইরা ত এসেছে—যাহক একটা ব্যবস্থা ওরাই করবে।

আন্নাকালী। আমার আর এক মিনিট সহ্য হচ্ছে না জাঁতি। মনে হচ্ছে হয় ওর গলাটা বঁটি দিয়ে কেটে ফেলি, নয়ত নিজেই নিজের গলাটা কাটি। তা হ্যাঁ আনি, তুই গ্যারেজের ভেতর থেকে দেখলি ত?

অঞ্জলি। হ্যাঁ, সেই যে ঘুলঘুলিটার কথা বলেছিলে না তুমি, সেইটা দিয়েই দেখলাম।

আন্নাকালী। যা না জাঁতি, তুইও একবার দেখে আয়, তাহলেই বুঝবি, মা সত্যি বলছে, না মিথ্যে বলছে!

সুজাতা। রক্ষে কর বাবা, ও বিশ্রী জিনিস আমি দেখতে পারবো না। অঞ্জি, তুই কিন্তু এসব কথা পৃথ্বীশকে বলবি না। হাজার হলেও জামাই ত, কি মনে করবে!

অঞ্জলি। আর তুই যদি হেমন্তবাবুকে বলিস?

সুজাতা। বাবা! চন্দর! লজ্জায় আমার মুখ দিয়ে বেরুবেই না। এ কি সোজা ঘেন্নার কথা!

[ভেতরে গলা-ঝাড়ার শব্দ, তার পরই দেখা গেল, বারান্দা দিয়ে ডাঃ সোম আসছেন]

আন্নাকালী। ঐ আপনি আসছে! এ তরফে কন? দিনরাত্রি ও-মহলে পড়ে থাকে মাগীকে নিয়ে, আমিও নিশ্চিন্দি থাকি। তোরা বল, ও বাড়ী যেতে—এখানে কি?

[প্রস্থান]

ডাঃ সোম। হ্যাঁ রে, তোরা এসেছিস সকালে—কৈ একবার ত ডাকিসও নি আমাকে। একটা পা কাবু হয়ে পড়েছে, চোখেও ক্রমেই কম দেখছি, তারি ওপর আছে সভা-সমিতি, কংগ্রেস, কর্পোরেশন—আর পারি না। জীবনটা যেন একটা বোঝা হয়ে উঠেছে। আটটার সময় বেরিয়েছিলাম, তখনো জানি না যে তোরা এসেছিস—এখনি ফিরে শুনলাম গিরীনের মুখে, তাই ভাবলাম, একবার নিজেই যাই, ওরা ত আর আসবে না।

সুজাতা। বাবা, তুমি দিনকতক আমার ওখানে গিয়ে থাকবে চলো। জল-হাওয়া ভালো, কোন হাঙ্গামাও নেই, দিব্যি নিরিবিলিতে পড়াশুনা করবে, লিখবে।

ডাঃ সোম। ইচ্ছে ত করে মা। এক এক সময় মনে হয় সব ছেড়ে ছুড়ে কোনো এক জায়গায় চলে যাই—তোদের নিয়ে শেষ ক'টা দিন নিশ্চিন্তে কাটিয়ে দিই। কিন্তু উপায় কি? ঢের কাজ যে বাকী রয়েছে।

অঞ্জলি। বেশ ত। দিদির ওখানে থেকেই কর না সে-সব।

ডাঃ সোম। তা ত হয় না রে পাগলী। আমার এই লেবরেটারি, এই লাইব্রেরী, যা সমস্ত জীবন ধরে গড়ে তুলেছি, এর বাইরে গেলে মেটিরিয়েল পাবো কোথায়? তাছাড়া আমার কি চোখ আছে, না শরীরের ওপর কোন হাত আছে? একটু রেফারেন্স দিতে হলে, একটা কোটেশন তুলতে হলে, এক স্লিপ লিখতে হলে, আজ আমায় নির্ভর করতে হয় অন্যের ওপর।

অঞ্জলি। তা একটা ভালো দেখে সেক্রেটারি রাখলেই ত হবে।

ডাঃ সোম। হয় না রে, হয় না। রাশি রাশি বই, পুঁথি, ম্যানাস্ক্রিপ্ট আছে, গাদী-গাদী নোট আছে—কোনটা কখন তৈরি করেছি, কোনটা কি

জন্যে সংগ্রহ করেছি, তা কি বাইরে থেকে কেউ এসে বুঝবে? এ সব হাতে ধরে ধরে চিনিয়েছি, বুঝিয়েছি, ইনডেক্সিং করিয়েছি নুসিকে দিয়ে—সে হল আমার অন্ধের নড়ি। আট খানা বই আমি লিখলাম শুধু তারি হাত দিয়ে। আমার সব ক'টা ওরিজিন্যাল রিসার্চই হতে পেরেছে শুধু ও ছিল বলে। এ কি আর যে-কোন একটা বি-এস-সি, এম-এস-সি'কে দিয়ে হয় কখনো?

সুজাতা। কিন্তু বাবা তোমার যে কিছুদিন এখন কোথাও গিয়ে থাকাই ভালো!

অঞ্জলি। আমরা ত সবই শুনেছি। বলো ত আমাদের মুখটা কি রকম ছোট হয় এ-সব হলে?

ডাঃ সোম। কি শুনেছিস অঞ্জু? যা শুনেছিস, তার সঙ্গে যা দেখছিস মিলিয়ে দেখ—তাহলেই বুঝবি, কি সম্ভব, আর কি অসম্ভব! এই আমি পঁয়ষট্টি বছরের বুড়ো—অন্ধ, অথর্ব—কবরের পথে পা বাড়িয়ে রয়েছি, আমার কাছে কি এই সবই প্রত্যাশিত?

অঞ্জলি। কিন্তু মা কি মিথ্যে কথা বলছেন?

ডাঃ সোম। তোদের মা চিরদিনই একটু হিষ্টিক্যাল—এখন আরো বেড়েছে—বয়সের নদীতে যতই ভাঁটা পড়ছে, ততই ওঁর ভেতর জেগে উঠছে নানা রকমের কমপ্লেক্স। নিজের মনেই সৃষ্টি করে নিচ্ছেন এক-একটা জিনিষ—আর তাই নিয়ে হৈ-হৈ কাণ্ড করছেন, নইলে দশ বছর ধরেই ত ও আসে-যায়, আমার সঙ্গে ওয়ার্ক করে—কোন দিন ত এ সব কথা ওঠে নি।

অঞ্জলি। এতদিন ওঠবার কিছু ছিল না, তাইতেই ওঠে নি। এখন উঠছে—আর সেটা তুমি চাপা দেবার জন্যেই মাকে পাগল প্রমাণ করতে চাইছো!

ডাঃ সোম। অঞ্জু, যতটা পর্য্যন্ত বলা উচিত, তুই তার চেয়ে বেশী বলছিস। মায়ের পক্ষ হয়ে তুই যাকে ঘা দিচ্ছিস, সে-ও তোর বাবা।

সুজাতা। এই অঞ্জু চুপ কর।

অঞ্জলি। চুপ করবো কেন? তুমি একটা থার্ড ক্লাস মেয়েমানুষ নিয়ে কেলেঙ্কারি করবে, আর আমরা তার জন্যে সমাজে অপদস্থ হবো? তুমি সর্ব্বস্ব লিখে দেবে তাকে, আর আমরা বড়লোকের মেয়ে হয়েও কিচ্ছুটি পাবো না?

ডাঃ সোম। কিন্তু আমি যদি সত্যিই তাই করি, তোরা কি করবি আমার? আমি তোদের মানুষ করেছি, লেখাপড়া শিখিয়েছি, বিয়ে-থাওয়া দিয়ে দিইছি, তোদের সম্বন্ধে আমার দায়িত্ব চুকে গেছে—আর নীপু—ও একটা নীরেট নিরক্ষর নির্দ্দয় জন্তু—ওকে আমি মানুষের মধ্যেই গণ্য করি না, তাই ওর জন্যে কোন দায়িত্ব নিতেও আমি প্রস্তুত নই—সুতরাং আমাকে তোরা আটকাবি কি দিয়ে?

সুজাতা অঞ্জি, চুপ কর!

ডাঃ সোম। সন্তান হয়ে তোরা আজ বিচারক হতে চাস আপন বাপের?

[সবেগে অন্নাকালীর প্রবেশ]

অন্নাকালী। ওরা চুপ করবে, কিন্তু আমার মুখ বন্ধ করবে কি দিয়ে ও? আমি ত বানে ভেসে আসি নি! ঠ্যাঁটা মিন্সে, এর পর সমস্ত ব্যাপার আমি ঢাকে-ঢোলে করে দোব না! বৈজ্ঞানিক হয়েছেন, না গুষ্টির পিণ্ডি হয়েছেন! চরিত্রহীন মাতাল কোথাকার!

ডাঃ সোম। দেখ, দেখ, এটা অস্বাভাবিক অবস্থা কি না!

অন্নাকালী। অস্বাভাবিক? হ্যাঁ অস্বাভাবিকই ত। দিচ্ছি মুণ্ডটা ভেঙে, তাহলেই স্বাভাবিক হবে।

সুজাতা। মা থামো। জামাইরা রয়েছে...

অন্নাকালী। থামবো কেন রে? কিসের জন্যে?

[ছুটে এসে ঘাড় ধরলেন]

ডাঃ সোম। ওঃ ওঃ মেরে ফেললে, মেরে ফেললে!

[সবেগে পৃথ্বীশ ও হেমন্তের প্রবেশ]

দুজনে। থামুন, থামুন।

[ঐ বাড়ীর দোতালা। পৃথ্বীশ ও হেমন্ত।]

পৃথ্বীশ। একটা টিপিক্যাল কপ্রোফিলিয়ার কেস।

হেমন্ত। কপ্রোফিলিয়া! সে আবার কি?

পৃথ্বীশ। জানেন না? একটা সেক্স-কম্প্লেক্স—কুৎসিত জিনিসের ওপর

এট্রাক্সন্, এই আমাদের তান্ত্রিক ব্যাটাদের মতন আর কি! বিলেতে দেখেন নি, নিগ্রো মেয়েদের নিয়ে একদল বড়লোক কি রকম কাড়াকাড়ি করে মরে?

হেমন্ত। হবে ভাই! আমাদের ছিল প্রি-ফয়েড আমলের বিলেত—তোমরা কত জিনিষই শিখেছো, যা আমাদের পাতে পড়েনি।

পৃথ্বীশ। আহা, সিষ্টেমেটিক বিজ্ঞানটা তৈরী করেছেন ফ্রয়েড, কিন্তু বিষয়টা ত আগে থাকতেই ছিল, একটু অবসারভেশন থাকলেই···

হেমন্ত। ঠিক এই স্তরের জিনিষগুলো অবসার্ভ করার সময় পাই নি। নিতান্তই বাপের কুপুত্র ছিলাম আর কি! যাক গে, থিওরি যাই হক, ব্যাপার হচ্ছে এই যে কর্ত্তা ঐ মাগীর খপ্পরে পড়েছেন—এখন হোয়াটস্ দ্যা ওয়ে আউট?

পৃথ্বীশ। জাষ্ট দি পয়েণ্ট! কর্ত্তাকে বেকাদায় ফেলে মাগী বিবাহ কার্য্যটি সমাধা করে নিয়েছে—এই হল জনশ্রুতি এবং ঠাকরুণেরও সিদ্ধান্ত এই। এখন তা যদি হয়ে থাকে, তাহলে ত আইনই ওকে সেফগার্ড করবে।

হেমন্ত। কি করে? প্রথমত এক স্ত্রী থাকলে, আর এক স্ত্রী-গ্রহণ সিভিল-ম্যারেজ-এক্ট অনুসারে হতে পারে না। বাইগেমি নট্ এলাউড্। দ্বিতীয়ত অসবর্ণ বিবাহ হিন্দু স্যাক্রামেণ্টাল ম্যারেজ হিসাবেও হতে পারে না। সুতরাং দ্যা ওয়েড্‌লক্ ক্যান্ ভেরি ওয়েল বি টার্ণড্ ইন্টু এ বোনাফাইডি কনকিউ-বিনেজ, ক্যাণ্ট ইট?

পৃথ্বীশ। বাই নো মিন্স! দেয়ার আর আদার ওয়েজ। ধরুন যদি কর্ত্তা ইসলাম নিয়ে প্রথম বিয়ে নাকচ করিয়ে, তারপর শুদ্ধি নিয়ে দ্বিতীয় বিয়েটা সেরে থাকেন সিভিল-ম্যারেজ-এক্ট অনুসারে, তাহলে ত সী ইজ হিজ ওনলি ওয়াইফ্ এগ্‌জিষ্টিং! আর যদি মিশন ম্যারেজ ইন্ সো-সো হিন্দু ফর্ম্মে করে থাকেন, তাহলেও ইট্‌স্ নো লেস্ ভ্যালিড—তবে অবশ্য লিটিগেশন্ চলতে পারে।

হেমন্ত। তাইত! তাহলে ত সত্যিই বিপদ!

পৃথ্বীশ। কিন্তু আমার কি ধারণা জানেন? কর্ত্তা বাড়ীর আবহাওয়া সুবিধে নয় দেখে, বিয়ের কথাটা রটিয়ে দিয়েছেন, আসলে বিয়েটা এখনো হয় নি।

হেমন্ত। কি করে এটা ঠিক করছো?

পৃথ্বীশ। করছি সারকমষ্ট্যান্শিয়াল্ এভিডেন্স থেকে।

হেমন্ত। কি রকম ?

পৃথ্বীশ। এই দেখুন না, ত্যা ওয়েজ ইন হুইচ দী ট্যু আর মুভিং! কর্ত্তা স্রেফ বাইবের মহলে গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছেন, গিন্নীর কাছে এগুনো ত দূরের কথা, এ মহলে পা দেবার সাহস পর্য্যন্ত নেই। আর ত্যা গার্ল—একদম নেংটি ইঁদুরটি হয়ে আছে! বিয়ে হয়ে গেলে, ঠিক এ রকমটা হত না—দু'জনেই তখন বুক ফুলিয়ে চলতো। চাই কি, এদের ধাক্কা মেরে খেদিয়েই দিতো বাড়ী থেকে!

হেমন্ত। নাও হতে পারে। ভদ্রলোকের বেশ একটু রেপুটেশন্ আছে—হঠাৎ এ বয়সে একটা কীডকে বিয়ে করেছেন, এটা রাষ্ট্র হয়ে গেলে মহা বিভ্রাট! তাইতেই হয়ত গ্র্যাণ্ড সাইলেন্স মেণ্টেন করছেন দু'জনে।

পৃথ্বীশ। ইট মে বি। ও-দেশে ত অবশ্য আকছার হয় এ ধরণের বিয়ে। এ বড়ই মুস্কিলের কথা!

হেমন্ত। মুস্কিলের কথা সব দেশেই। জানো ত বার্টি রাসেলের কি হাল হয়েছিল! তাছাড়া ভাবো ত, এ ম্যান অব্ সেভেণ্টি-টু, উইথ এ ব্যাটালিয়ান অব্ চিলড্রেন এণ্ড গ্র্যাণ্ড চিলড্রেন, এণ্ড এ গুড বিট অব্ রেপুটেশন্ এজ এ ফার্ষ্ট রেট সায়েন্টিষ্ট!

পৃথ্বীশ। রিয়্যালি! রিডিকিলাস! কিন্তু শুধু থিওরাইজিং করলে ত চলবে না—সামথিং পজেটিভ হ্যাজ টু বি ডান, এবং সেটা কি ?

হেমন্ত। তুমিই বলো না। আইনজ্ঞ লোক…

পৃথ্বীশ। একটু বে-আইনী করতে হবে। প্ল্যান রেডি—অঞ্জলিকে বলেছি, মেয়েটিকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে আমাদের কাছে নিয়ে আসতে—আই অ্যাম সিওর, সী উইল ডু ছ্যাট রাইট নাউ। তারপর দেখুন ত আমি কি করি!

হেমন্ত। যাই করো ব্রাদার, মারধোরটা বাদ দিয়ে। ওটা বড্ড স্ক্যাণ্ডালাস্ হয়ে পড়বে। ঐ যে, ঐ ত…

পৃথ্বীশ। সাইলেন্স প্লিজ!

[অঞ্জলি ও লুসির প্রবেশ]

অঞ্জলি। মিস লুসি রায় এম-এ—আমার হাজব্যাণ্ড, আর ইনি আমার ভগিনীপতি।

পৃথ্বীশ। ভারী খুসী হলাম আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে। শুনেছি, আপনি নাকি কোয়াণ্টাম্ থিওরি নিয়ে রিসার্চ্চ করছেন!

লুসি। এমন আর কি? অল্পস্বল্প চেষ্টা করছি।

পৃথ্বীশ। কম কথা নয়! কি বলেন দাদা? কোয়াণ্টাম্ থিওরি ইজ্ নো জোক্ ইভন ফর্ এ ম্যান!

হেমন্ত। বটেই ত!

পৃথ্বীশ। তা দেখুন মিস্ রায়, আপনার সঙ্গে আমাদের কিন্তু একটু আন্প্লেজেণ্ট জব আছে।

লুসি। বলুন।

[অঞ্জলির প্রস্থান]

পৃথ্বীশ। দেখুন, আপনি নিশ্চয় টের পেয়েছেন যে আপনাকে নিয়ে এই ফ্যামিলিতে একটা কমোশন সৃষ্টি হয়েছে। রাইট অর রং, এটা ত বাঞ্ছনীয় নয়। ডাঃ সোম, মানে শ্বশুরমশায় হচ্ছেন একজন গ্রেট ফীগার, আপনিও একজন প্রমিসিং গার্ল—এটা ত বন্ধ করতে হবে!

লুসি। দেখুন, সবটাই হয়েছে মিসেস সোমের ভুল হাইপোথেসিস থেকে। এ ত একটা অব্‌সেসনের ব্যাপার—আমি কি করতে পারি এতে?

পৃথ্বীশ। ইট মে বি যে তিনি একটু এবনম্যালি ডিস্‌পোস্‌ড্, কিংবা এজ ইউ পিপ্‌ল্ স্যে, হিষ্টিরিক, কিন্তু আপনিই বা কেন টু হার রিলিফ, এ বাড়ী ছাড়ছেন না?

লুসি। দুটো কারণে পারি না। প্রথমত আমি যদি চলে যাই, তাহলে সমস্তটা আমার এডমিট করে নেওয়া হবে, হুইচ আই এম নট্ গোইং টু ডু—যেহেতু তা সত্যি নয়। দ্বিতীয়ত ডাঃ সোম এমন একটা জিনিষ নিয়ে রিচার্চ্চ করছেন, যার আনুপূর্ব্বিক মেটিরিয়েল সর্ট করেছি আমি—আমি চলে গেলে, তিনি আর তা শেষ করে উঠতে পারবেন না, তাতে গোটা পৃথিবীই একটা বড় জিনিষ থেকে বঞ্চিত হবে।

পৃথ্বীশ। অল ভেরী অনেষ্ট। কিন্তু আপনার নিজের কি কোনই ইন্টারেষ্ট নেই?

লুসি। আছে বৈ কি।

পৃথ্বীশ। কি সেটা?

লুসি। তার কৈফিয়ৎ আমি আপনাকে দোব না।

পৃথ্বীশ। ইউ ম্যাষ্ট!

হেমন্ত। আহা কথাটা হচ্ছে...

পৃথ্বীশ। কথাটা কিছুই নয়, প্লেনলি, আপনাকে এই বাড়ী ছাড়তে হবে এবং রাইট নাউ। নইলে···

লুসি। নইলে কি করবেন?

পৃথ্বীশ। এক্সিউজ মি, তাহলে আপনাকে আমি কোয়ার্স করবো।

লুসি। আপনার কোয়ার্সানের আমি ধার ধারি না, বোধহয় জানেন!

হেমন্ত। আহা, দি থিং ইজ...

পৃথ্বীশ। থামুন। আমি করছি এর ব্যবস্থা। নীপু, নীপু!

[নৃপেনের প্রবেশ]

নৃপেন। ব্যাপার কি?

পৃথ্বীশ। দিস ল্যো মিক্স্—কাণ্ট ইউ এসার্ট ইওর ম্যানহুড আপ্-অন্ হার?

লুসি। সাবধান কিন্তু নীপু।

নৃপেন। চোপ রও!

[আঁচল চেপে ধরলো।

সবেগে সুজাতার প্রবেশ।]

সুজাতা। নেপি, ছি! ছেড়ে দে শীগ্রী! তোকে ও হাতে দেখেছে—জানিস? আয় লুসি, তুই আমার সঙ্গে চলে আয়!

পৃথ্বীশ। ড্যাম্ ইট! দিজ উইমেন ফোক!

সুজাতা। চুপ করো পৃথ্বীশ, দু'বছর বিলেতে বাস করে তুমি এমন কিছু সাহেব হয়ে যাও নি! বাঙালীর ছেলে, বাঙালীর মেয়ের সম্মান রাখতে শেখো নি—ছি-ছি!

পৃথ্বীশ। আপনাদের জন্তেই ম্যাডাম।

সুজাতা। না, আমাদের জন্তে নয়। আমরা কেউ তোমাকে বলিনি, বাড়ীর ভেতর একটি ভদ্রমহিলাকে ধরে কাপড় কেড়ে নিতে। আর তুমি, তুমিও কি বুদ্ধির মাথা খেয়ে বসেছো!

হেমন্ত। বাস্তবিকই! না-না, আমায় ক্ষমা করবেন মিস রায়—আমি

বড়ই লজ্জিত হয়েছি। আমি ত এসব চাই নি—আপনি ত জানেন, আমার কোন দোষ নেই!

সুজাতা। একশো বার আছে। তুমি না পুরুষ মানুষ, তুমি না একজন অধ্যাপক? ছি-ছি! যাও, যাও, তোমরা এখান থেকে। আর নেপি, জানোয়ার কোথাকার, তোর কি মা-মাসী জ্ঞান নেই?

[হেমন্ত, পৃথ্বীশ ও নৃপেনের প্রস্থান।]

লুসি। জাঁতি কি করেছি আমি তোদের? কি করেছি, বল ত শুনি!

সুজাতা। কি করেছিস, কি না করেছিস, আমি ত কিছুই জানি নে। সবই শুধু শুনেছি—শুনে রাগও করেছি খুব। কিন্তু তাই বলে তোকে কেউ অপমান করুক, এ আমি চাই নি, চাইতেই পারিনে।

লুসি। আমি তোদের এখানে আসি—ডাঃ সোম বড়ই একলা, বড়ই অসহায়, তাঁর কাজ-কর্ম্মে যতটা পারি সাহায্য করি, তার বদলে কিছুই নিই নে—এ ত জানিস! আর যা-কিছু শুনেছিস...

সুজাতা। ছি কাঁদিস নে। যদি কিছু হয়েই থাকে, বল আমাকে—বাবা যদি তোকে ভালোবেসে থাকেন, কিম্বা যদি তোকে কোন কিছু...

লুসি। আমায় কিছু জিজ্ঞাসা করিস নে জাঁতি, কিচ্ছু বলিস নে। তেরো বছরের সম্বন্ধ তোর সঙ্গে—একদিন জানতে পারবি সবই। তবে আজ যে তুই আমায় প্রকাণ্ড অপমানের হাত থেকে বাঁচালি, এর জন্যে...

[লুসির প্রস্থান। অঞ্জলির প্রবেশ।]

অঞ্জলি। এই যদি তোর ইচ্ছে ছিল দিদি, তবে কেন ওঁকে বললি, সব ভার নিতে? এত অপমান ওঁকে করবার অধিকার তোর হল কোথা থেকে?

সুজাতা। দেখ অঞ্জি, ভদ্রলোকের বিবাদ ভদ্রলোকের মতোই হওয়া উচিত। পৃথ্বীশ যা করেছে...

অঞ্জলি। ঠিকই করেছে। কিন্তু থাক দিদি, আমরা চললাম এ বাড়ী থেকে। তুমি এর পর প্রাণের সইয়ের সঙ্গে ঘটকালি করে বাবার বিয়ে দাওগে। দরকার বোঝো ত নেমন্তন্ন করো, বৌ-ভাতটা খেয়ে যাবো!

সুজাতা। দরকার হলেই করবো।

[ঐ বাড়ীর বারান্দা। আন্নাকালী ও সুজাতা।]

আন্নাকালী। ছেড়ে দে জাঁতি, ছেড়ে দে আমাকে!

সুজাতা। মা ঠাণ্ডা হও, ঠাণ্ডা হও। ভেবে দেখো, পাড়াশুদ্ধু লোক আমাদের কি ভাবছে! সবাই কান খাড়া করে রয়েছে, এত বড় মান-সম্ভ্রম, এতখানি খাতির-সম্মান...

আন্নাকালী। চাই নে, চাই নে! সমস্ত জীবন আমায় জালিয়েছে মদ নিয়ে, মেয়েমানুষ নিয়ে—মুখ বুঁজে সহ্য করেছি চিরদিন, আর সহ্য করবো না আমি। কি হবে এই ফাঁকা সম্মান নিয়ে, যদি শান্তিই না পেলাম? এই যে আশেপাশে হাজার হাজার কেরানী, মাষ্টার, উকিল রয়েছে—পঞ্চাশ টাকা একশো টাকায় ওদের দিন চলে—ওরা আমাদের চেয়ে ঢের সুখী, ঢের সুখী ঐ বস্তির মজুররা।

সুজাতা। কি করবে মা? এত বড় স্বামী ত খুব কম মেয়ের ভাগ্যেই জোটে—কিন্তু তবু সুখ হল না, সে তোমার অদৃষ্ট। এ নিয়ে আর কেলেঙ্কারি করে কি হবে? মধ্যে থেকে সবাই হাসবে, যারা দু-দিন আগেও চোখ তুলে চাইতে সাহস করে নি, তারাও আজ আহা বলবে! তাই ত বলছি তোমাকে, সয়ে যাও।

আন্নাকালী। না, না, আর আমায় সইতে বলিস নে। আমি ওকে মারবো—তারপর নিজেও মরবো।

সুজাতা। সে কি আর একটা কাজের কথা হল মা? উপায় ত নেই—মেয়েমানুষ এ-দেশে যে বড়ই পরাধীন! পুরুষমানুষ যদি মনে করে তাকে দুঃখ দেবে, তাহলে তার আর নিস্তার নেই।

আন্নাকালী। তুই ত বলছিস! ভেবে দেখ দেখি, কাল হেমন্ত যদি আর একটা মেয়েকে জুটিয়ে আনে, তাহলে তোর কেমন লাগে!

সুজাতা। যদি আনেই, কি আর করবো? তুমি ত বুড়ো হয়েছো মা—এতকাল ঘর-সংসার করলে, না হয় এখন সব ছেড়েছুড়েই দাও, যা প্রাণ চায় করুক ওরা।

আন্নাকালী। পারে না, পারে না—মেয়েমানুষ তা পারে না। স্বামী যমকে দেওয়া যায়, অন্য কারুকে দেওয়া যায় না—এর ছেলে-বুড়ো নেই জাঁতি, সব মেয়েরই ধরণ এক।

সুজাতা। সে-কালে ত সতীন থাকতো মা সব মেয়েরই। এ-কালেই না হয় সেটা নেই। তারাও ত বেঁচে থাকতো, ঘর-সংসার করতো!

আন্নাকালী। করতো, কিন্তু আমি বুঝতে পারছি, কি কষ্টে তারা ঘর করতো। সে কষ্ট ভোগ করার জন্মেই কি আমি বেঁচে থাকবো? এ তুই বলছিস কি জাঁতি?

সুজাতা। অন্য উপায় যে নেই মা। বাবা যদি ওকে ভালোবেসে থাকেন, আমাদের সকলের অপছন্দ জেনেও যদি জোর করে ওকে বিয়ে করে থাকেন, কি করবো আমরা? স্বীকার করেই নিতে হবে।

আন্নাকালী। আমি পারবো না জাঁতি। জীবনে কোন সাধই মেটে নি আমার—কোন দিনই পাই নি এতটুকু ভালোবাসা, এতটুকু সম্মান—পশুর মতো পেটে ধরেছি ক'টা ছেলে-মেয়ে—পশুর মতো খেয়েছি দুটো—দিনরাত কাটিয়েছে লেখাপড়া নিয়ে, যন্ত্রপাতি নিয়ে, আজ এখানে কাল সেখানে, পরশু ওখানে করে বেড়িয়েছে—সবটুকু আদর, সবটুকু ভালোবাসা কুড়িয়েছে বাইরের মেয়েরা—আমি থেকেছি হাঁড়িকুড়ি আর ছেলেপুলে নিয়ে এককোণে পড়ে। বয়স ত আমারো একদিন কম ছিল জাঁতি!

সুজাতা। সে ত সবি জানি মা!

আন্নাকালী। এই যে তুই স্বামীর সঙ্গে বিলেত গেলি, এই যে একসঙ্গে তোরা সভা-সমিতি করিস, এতে সত্যি কথা বলছি জাঁতি, আমার ভীষণ হিংসা হয়—আমার জীবনে কোন দিনই আসে নি এ সুযোগ। আমি শুধু বড়লোকের বৌ, কিন্তু নিজে আমি কিছুই না, মানুষই নই!

সুজাতা। ভাগ্য মা!

আন্নাকালী। এতদিন তা-ও সহ্য করেছি। শেষে দিন যখন ফুরিয়ে এসেছে, তখন কিনা আমারি চোখের ওপর একটা ছুঁড়ীকে ও বিয়ে করলো—
—আর এতকাল আগলে রাখলাম যে সংসার, যে জিনিসপত্তর, তা দিলে তাকে উইল করে! এখনো বলিস তুই আমাকে চুপ করে থাকতে? ভাব ত এর-পর আমার কি গতি। ঐ সতীনের ঝাঁটা-লাথি, আর তার হাত-তোলা দু-মুঠো ভাত!

সুজাতা। বিয়ে কি সত্যিই হয়েছে মা?

আন্নাকালী। হয়েছে। না হয়ে উপায় কি? ও যে পোয়াতি হয়েছে!

সুজাতা। কি করে জানলে তুমি?

আন্নাকালী। কেন আমার বয়স হয়নি? বুঝি না কিছু?

[প্রস্থান]

[অঞ্জলি ও পৃথ্বীশের প্রবেশ]

অঞ্জলি। আমরা এ সব নোংরা ব্যাপারের ভেতর নেই—আমি বলে শাশুড়ী-ননদের মুখ-নাড়াই সহ্য করি নি, তা তোমাদের কথা সহ্য করতে যাবো কি জন্যে?

সুজাতা। অঞ্জি, অন্যটা কিন্তু ভালো নয়! এমন কিছুই হয় নি যাতে তোরা এত অপমান বোধ করতে পারিস।

অঞ্জলি। আমাকে বলতে পারো দু-কথা, কিন্তু উনি? উনি কেন তোমার চোক-রাঙানি সইবেন?

সুজাতা। আজ ত উনির হয়ে লড়তে এসেছিস, কিন্তু একদিন ঐ উনিকে পাইয়ে দিয়েছিলাম আমিই, সে কথা ভুলে যাসনে অঞ্জি।

পৃথ্বীশ। এক্সিউজ মি, আপনিই ত বলেছিলেন আমার ব্যাপারটা টেক-আপ করতে।

সুজাতা। বলেছিলাম। কিন্তু তার মানে কি এই যে একটি ভদ্রমহিলাকে ধরে পুরে তোমরা মারবে, আর তার কাপড় কেড়ে নেবে?

পৃথ্বীশ। নট এক্স্যাক্টলি। শুধু একটু কোয়ার্স করছিলাম।

সুজাতা। ভদ্রলোকের মেয়েকে কোন ভদ্রলোক কোয়ার্স করে এইভাবে? তোমার স্ত্রীকে, কি আমাকে যদি কেউ...

অঞ্জলি। আমাদের সঙ্গে ওর তুলনা করো না দিদি।

সুজাতা। কেন করবো না? গরীবের মেয়ে বলে? নইলে তোর-আমার চেয়ে ও ছোট কিসে? বরং বিদ্যে-বুদ্ধিতে তোর আমার ত দূরের কথা, আমাদের স্বামীদের চেয়েও ও অনেক বড়, নইলে বাবার কাছে কোন দিন পাত্তা পেতো না। বেশী অহঙ্কার করিসনে অঞ্জু!

অঞ্জলি। আমার স্বামী সম্বন্ধে তোমার ক্রিটিসিজম করার কোন অধিকার নেই দিদি। তোমার স্বামী...

[হেমন্তর প্রবেশ]

হেমন্ত। কি বকাবকি করছো সবাই? আমরা সবাই ভালো, 'কেউ বা

দিব্যি গৌরবরণ, কেউ বা দিব্যি কালো'! আসল ইস্যু রইলো পড়ে, একটা বাজে ব্যাপার নিয়ে তাল-ঠোকাঠুকি সুরু করে দিয়েছো!

সুজাতা। তোমার জন্যেই ত হল। তুমি কেন ঐ বুদ্ধি দিতে গেলে?

হেমন্ত। বুঝিনি। উনি যে অতখানি ডিগ্‌নিফায়েড ষ্ট্যাণ্ড নিতে পারবেন, এ আর কেমন করে বুঝবো বলো? সেই থেকে লজ্জায় আমি মরে আছি! মনে হচ্ছে, সমস্ত গালে যেন কালি মাখিয়ে দিয়ে গেছেন ভদ্রমহিলা। রিয়্যালি, সম্মানের পাত্র বটে!

পৃথ্বীশ। বাট্ ডোন্ট্ ইউ থিঙ্ক, ইট্ ওয়াজ এ বিট্ ট্যু ড্রামাটিক?

হেমন্ত। সেটা হয়েছে আমাদের দিক থেকে।

[কাশতে কাশতে ডাঃ সোম আসছেন]

পৃথ্বীশ। আবার একটা আন্‌প্লেজেণ্ট সামথিং হল দেখছি। এখন না এলেই বোধহয়...

সুজাতা। বলো কি পৃথ্বীশ, বাবার বাড়ী, বাবার ঘর, তিনি আসবে না?

ডাঃ সোম। ওঃ ওঃ, এইখানটায় বসি—এইখানে চেয়ারটা ··

হেমন্ত। এই যে বসুন, বসুন। গায়ে-মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দাও সুজাতা। অঞ্জলি, টেবিল-ফ্যানটা এখানে দিতে বলো গিরীনকে।

ডাঃ সোম। থাক। ওঃ ওঃ, বুকের ভেতরটা যেন বড্ডই কেমন করছে!

সুজাতা। এতখানি উঠে এলে কেন বাবা? এই শরীরে কি আর পোষায় তোমার?

ডাঃ সোম। কি করি মা? আমাকে ত সবাই বর্জ্জন করেছে! একা পড়ে থাকি বাইরের মহলে, পাঁচজন আসে দয়া করে—দয়া করেই করে যেন এটা-সেটা! হঠাৎ একদিন ঘুম থেকে উঠেই দেখলাম, যেন সবাইয়ের কাছ থেকে অনেক দূরে এসে পড়েছি—এ পৃথিবীতে যেন কেউই নেই আমার!

সুজাতা। থাক বাবা, তুমি বড্ড হাঁপাচ্ছো। একটু জিরিয়ে নাও, তার পর বলো।

ডাঃ সোম। জাঁতু, আর সময় হবে না মা! বলে নিই যা বলার আছে—নইলে বড়ই আফশোষ থেকে যাবে সবাইয়ের, আমারও শান্তি হবে না!

অঞ্জলি। দেখতে পাচ্ছো না বাবা কি রকম করছেন? শীগ্গী ডাক্তারকে ফোন করো।

ডাঃ সোম। ব্যস্ত হসনে পাগলী, ভয় নেই কিছু! হ্যাঁ, চিরদিন আমি দুনিয়ায় একলা—খুব ছোটবেলায় মা-বাবা গিয়েছিলেন, মানুষ হয়েছি পরের আশ্রয়ে। বুদ্ধিটা ছিল একটু বেশী মাত্রায়—বন্ধুরা এটে উঠতে পারে নি, সবাই তাইতে হয়েছে বিরূপ। তার পর হল বয়স--বিদ্যাটাও হয়ে গেল বড্ড বেশী, সমব্যবসায়ীরা তাইতে হল বিরূপ। দেশে-বিদেশে ছুটে বেড়িয়েছি, সংগ্রহ করেছি যা পেরেছি--কিন্তু সঙ্গী পাই নি, এমন কোন লোক পাই নি, যাকে দিতে পারি সব কিছুর সঙ্গেই নিজের জীবনটার ভার! ওঃ ওঃ, কি যেন একটা চোখের সামনে ঘুরছে!

সুজাতা। শোবে বাবা, বিছানা করে দোব?

ডাঃ সোম। আর একটু পরে। হ্যাঁ, একাই করেছি সব, কিন্তু শরীর পড়ে গেল—আর কিছুই করা হয় না, কিন্তু তখনো আমার পুঁজি আছে অনেক, সেই সময় পেলাম লুসিকে—সে নিলে আমার সব কিছুর ভার—সে আমার ছাত্রী, সে আমার ভৃত্য—যখন সবাই গেছে অনেক দূরে সরে, তখন দয়া করে সে এলো এগিয়ে এবং এলো আর কিছুর জন্যে নয়, শুধু আমার সামান্য কিছু কাজের প্রতি শ্রদ্ধাবশে।

হেমন্ত। বিশ্রাম করুন, একটু বিশ্রাম।

ডাঃ সোম। ভাবলাম, হাতের কাজগুলো তাড়াতাড়ি সেরে নিই ওর সাহায্যে। কত বড় বিদ্বান ও, তা ত তোমরা জানো না, জানে দিশ-বিদেশের পণ্ডিতরা। যাকগে, দয়া করে ও হল আমার অভিভাবক। তারপরই উঠলো জনশ্রুতি—যারা কোন দিনই পারে নি আমার সঙ্গে, নানা ক্ষেত্রে গিয়েছে হেরে, পেয়েছে বহু আঘাত, তারাই রটনা করলে অনেক কিছু গুজব। সেই গুজব ভেসে এলো বাড়ী পর্যন্ত। তখন থেকেই সুরু হল...

পৃথ্বীশ। আজ্ঞে লোকে ত বলছে···

সুজাতা। থামো পৃথ্বীশ।

ডাঃ সোম। লোকে কি বলছে শুনেছি আমি। কিন্তু সবই বাজে। লুসির বিয়ে দিয়েছি আমি, আমারি ছাত্র ডাঃ অম্বুজ সরকারের সঙ্গে—লুসি আমার পালিত মেয়ে, আমার শেষ জীবনের সব চেয়ে বড় বন্ধু, সব চেয়ে বড় সেবক! হ্যাঁ, আর ওরা—ওরাই শুধু বুঝেছে আমার মূল্য!

সুজাতা। কেঁদো না বাবা, কেঁদো না।

ডাঃ সোম। তাই আমার এই সমস্ত জীবনের সংগ্রহ, আমার বুকের রক্ত, আমার প্রাণের চেয়েও বড় এই লাইব্রেরী আর লেবরেটারী আমি যৌতুক দিয়েছি ওদের। ওরা, ওঃ ওঃ...

সুজাতা। ও কি, ও কি, বাবা, বাবা!

ডাঃ সোম। ওঃ ওঃ ওঃ...

অঞ্জলি। বাবা, বাবা!

সুজাতা। মা শীগ্‌গী এসো, শীগ্‌গী এসো, বাবা নেই, বাবা আমাদের চলে গেছেন!

হেমন্ত। থামো, থামো!

সুজাতা। থামবো না। বাবাকে তোমরা মেরে ফেললে, অন্যায় করে মেরে ফেললে। বাবা গো, বাবা!

আগুন

[ব্যবসায়ী বিনোদবাবুর বৈঠকখানা। সকাল বেলা তিনি খবরের কাগজ পড়ছেন— সামনে বসে মথুরা গোলদার।]

মথুরা। এই বলে দিলাম আপনাকে, আর কোন দিন যেন আপনার ছেলে আমার বাড়ী না ঢোকে।

বিনোদ। সে যদি ভদ্রলোকের ছেলে হয় ত আর যাবে না। যে সমস্ত জিনিষ আমি অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করি, নিজের জীবনে যা কখনো করিনি, আমার ছেলে হয়ে সে তাই করেছে—এর চেয়ে তার মৃত্যু সংবাদ শুনলে আমি বেশী সুখী হতাম।

মথুরা। কি করবেন বলুন? ছেলে মেয়ের জন্মের জন্য পিতা-মাতা দায়ী, কিন্তু কর্ম্মের দায় ত তাদের নিজের। একটু শাসন করে দেবেন।

বিনোদ। সে আর বলতে হবে না, তেমন লোকই আমি নই। আর যাতে কোন কালে আপনার বাড়ীর ত্রিসীমানায় না যায়, তার ব্যবস্থা আমি করবো। তবে আপনিও আপনার মেয়েকে একটু ধমকে দেবেন যা শুনলাম, তাতে আমার মনে হচ্ছে, আপনার মেয়েরও এতে সায় ছিল।

মথুরা। সায় ছিল? নেহাৎ ছেলেমানুষ, সে এ সবের বোঝে কি? ছেলে না ছেলে, বন্ধু না বন্ধু—সহজভাবে বিশ্বাস করেছে, সরলভাবে মিশেছে। ওর যে পেটে পেটে এত বিদ্যে, তা সে টের পাবে কি করে?

বিনোদ। দেখুন, সব বাপ-মাই আপন ছেলে-মেয়েকে ছেলেমানুষ ভাবে। কিন্তু প্রকৃতির কাছে কোন পক্ষপাত নেই, সময় হলে সে ছেলেকেও সব শেখায়, মেয়েকেও যা শেখাবার তা শেখাতে ছাড়ে না। আমার ছেলে দোষ করেছে ঠিকই, তাকে শাসনও করবো আমি, কিন্তু আপনিও ভাববেন না যে আপনার মেয়ে একেবারে নিষ্পাপ—সে নিশ্চয়ই ওকে গোড়ায় আস্কারা দিয়েছে।

মথুরা। আশ্বারা। আপনি আমাকে জানেন না মশাই। আমি আপনাদের একেলে তন্ত্রের লোক নই—মেয়েকে আমি দিন-রাত্তির কড়া নজরে রাখি, একটু বেচাল দেখলে একেবারে কেটে ফেলবো না! আমার বাড়ীর ধরণই অন্য রকম—আর পাঁচ জনের মেয়ের মতো আমার মেয়ে দুনিয়াশুদ্ধু চ্যাংড়ার সঙ্গে আজ থিয়েটার, কাল বন-ভোজন করে বেড়ায় না—সে রীতি-মতো শিবপূজো করে, সন্ধ্যা-স্বস্ত্যয়ন না করে জল খায় না। আর তার বয়সই বা কত? এই ত সবে পনেরোতে পা দিয়েছে!

বিনোদ। বয়স আমার ছেলেরও আঠারোর বেশী নয়। কিন্তু এই বয়সটাই হচ্ছে সব চেয়ে বিপদের বয়স—এ সময় জ্ঞান থাকে না, বুদ্ধি থাকে না, ভয় থাকে না, অথচ ছেলে-মেয়ের মনে পাপ ঢোকে এই সময়েই। তাই বলছিলাম, একটু চাপ দিয়ে দেখবেন, আপনার মেয়েও কিছু করেছে।

মথুরা। চাপ বলে চাপ! তাকে আমি এক রকম নজরবন্দী করে রেখেছি শনিবার থেকে—স্কুলে যেতে দিচ্ছি না, ছাদে উঠতে, জানলার কাছে দাঁড়াতে দিচ্ছি না—হাতে একটি পয়সা দিচ্ছি না—করুক না সে কি করবে। ঐ যে বললাম, আমার ব্যবস্থাই অন্য রকম।

বিনোদ। সে ভালোই করেছেন। কিন্তু এ সবের দরকারই হ'ত না, যদি প্রথম প্রথম ও-রকম রাশ আলগা না দিতেন! আপনারা এক জাত আমরা এক জাত—আমাদের রীতি-নীতি চাল-চলন আদর্শ সবই আলাদা রকম, এ অবস্থায় সোমত্ত মেয়েকে কেন আপনি বাইরের একটা বেটাছেলের সঙ্গে মিশতে দিয়েছিলেন?

মথুরা। সন্দেহ করিনি মশাই। আমি থাকি নিজের কাজ-কর্ম্ম নিয়ে—গিন্নী সে-রকম হুঁসিয়ার নন, তিনিও আঁচ করতে পারেন নি। হঠাৎ সেদিন আমার হাতে পড়লো আপনার ছেলের এই চিঠি—সেই সঙ্গেই পাঁচজনের মুখে শুনলাম উড়োউড়ি খবর অনেক রকম, যা মোটেই ভালো নয়।

বিনোদ। তাই ত বলছি আপনাকে যে দোষ দু'জনেরই। এক পক্ষ টোকা দিলে, অন্য পক্ষ তাতে সাড়া দিলে, তবেই এই সব ব্যাপার ঘটে। আমার ছেলেই আগে করুক, আর আপনার মেয়েই আগে করুক, একজন আগে সাহস করেছে, অন্যজন তারপর এগিয়েছে। শেষ পর্য্যন্ত দু'জনেই এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে।

মথুরা। মশায় কি নিজের মেয়ের দৃষ্টান্তে সব মেয়ের বিচার করছেন ?

বিনোদ। নিজের মেয়ের ? তার সম্বন্ধে আপনি কি জানেন যে এত বড় কথা ফট করে বলে বসলেন ?

মথুরা। জানি মশায়, কিছু কিছু জানি বৈকি। সবাই জানে এ অঞ্চলের। কিন্তু থাকগে ওসব কথা—আপনার ছেলের কীর্ত্তি কলাপ জানিয়ে গেলাম আপনাকে, তার লেখা এই চিঠিও রইলো—দরকার মনে করেন, তাকে সাবধান করে দেবেন, নইলে কিন্তু আমার হাতে তার প্রাণটি যাবে।

বিনোদ। অসংখ্য ধন্যবাদ। কিন্তু মশায়কে আমি এখনি সদর রাস্তা খুঁজে নিতে পরামর্শ দিচ্ছি।

মথুরা। অত চোখ গরম করবেন না। চোখ দুটো আমারও আছে—পয়সাওলা আছেন, আপন ঘরে আছেন, আমি বেয়াৎ করে চলবো না।

[প্রস্থান]

বিনোদ। বনমালী, তোর মাকে একবার ডেকে দে তো শীগ্‌গী করে।

[বিনোদবাবু চিঠিখানা পড়তে লাগলেন। ঘরে এসে ঢুকলেন বিরজা।]

বিরজা। কি বলছো ? চানে বেরুচ্ছি, বেলা হয়েছে ঢের।

বিনোদ। তোমরা কি আমাকে পাগল না করে ছাড়বে না ? আর ত পারিনে আমি !

বিরজা। কেন কি হল কি ?

বিনোদ। হল আমার মাথা আর মুণ্ডু। বড় পুত্তুর গেলেন বিদ্যা-নিকেতনে আর্ট শিখতে, শিখলেন কি তা তিনিই জানেন—শুধু দেখলাম, বাবরি চুল, ঢিলে পায়জামা, ঢোলা পাঞ্জাবী, আর নাকে-টেপা চশমা—ছাড়িয়ে আনলাম জোর করে—পিছু পিছু বাড়ী এসে উঠলো এক শনিগ্রহ। ভাবলাম, ওটা গোল্লায় গেল গেলই, ছোটটা বুঝি মানুষ হবে। সে-ও দেখতে দেখতে লায়েক হয়ে উঠলো !

বিরজা। কি করেছে কি ?

বিনোদ। করেছে কি এই দেখো। তোমার গুণধর পুত্র মথুরা গোলদারের মেয়েকে এই প্রেমপত্র লিখেছে। সে এসে আজ সকাল বেলা যা মুখে আসে তাই বলে আমায় অপমান করে গেল। এই তোমার ছেলের জন-সেবা, এই তার স্বদেশীপণা—এবার বুঝেছো !

বিরজা। হ্যাঁ, এ ত খোকনেরই লেখা। পড়ো ত কি লিখেছে!

বিনোদ। পড়োগে তুমি। আর দরকার বোঝো ত দূতিয়ালী করোগে ছেলের হয়ে। আমি এই বলে দিচ্ছি তোমাকে—সন্ধ্যের পর যেন ওদের আর আমি এ বাড়ীতে না দেখি। কি মনে করেছে ওরা? কিছু বলি না বলে আমি কি বোবা, না উজবুক?

বিরজা। থামো, থামো, বড হয়েছে ছেলেপুলে, ওসব কথা শুনলে তারা সত্যিই বিবাগী হয়ে বেরিয়ে যাবে। এই যুদ্ধ-লড়াইয়ের দিন, শেষে যাবে যুদ্ধে চলে! একটু রেখে ঢেকে কথা বলতে হয়!

বিনোদ। যাক যেখানে খুসী। ও রকম ছেলে থাকায় লাভ কি?

বিরজা। আমি ত মা হয়ে সে-কথা বলতে পারবো না। এই যে নিম্পরের মেয়ে এনা এসে বাড়ীতে রয়েছে, এ কি আমারি ভালো লাগছে? কিন্তু কি করবো? কিছু বলতে পারছি না, হাবুল তাহলে এক্ষুণি কোথায় চলে যাবে! আর দুলুর দোষ কি? মথুরার মেয়েকে তুমি দেখেছো? একে ত সুন্দরী, তার ওপর ভীষণ গায়ে-পড়া, সোমত্ত ছেলে, কাবু হয়ে পড়েছে!

বিনোদ। তাহলে তুমি কি বলতে চাও? আমরা চোখ বুঁজে থাকবো, আর ওরা আমাদের নাকের ওপর বসে যা-খুসী তাই করতে থাকবে? তারপর পাড়াশুদ্ধ লোক এসে কেউ গাল দিয়ে যাবে, কেউ দু'ঘা বসিয়ে দিয়ে যাবে?

বিরজা। তা কেন? বুঝিয়ে বলতে হবে, বারণ করতে হবে। যে বয়সের যা, এখন ত আর ছোটটি নেই যে গালাগালি করলে ভয় পাবে!

বিনোদ। সেটা বলবে কে?

বিরজা। আমিই বলবো।

বিনোদ। ইস! তুমি যদি মানুষই হবে, তাহলে কি ছেলে-মেয়েগুলো এমন অধঃপাতে যায়? কার কথা বলবো? মেয়েটাই কি কম বাড়িয়েছে? সে কি না জ্যোৎস্না রাতে সুশীলের সঙ্গে যায় রাণীর ঘাটে ডিঙি চালাতে!

বিরজা। সে ত বলেই গিয়েছে তোমাকে!

বিনোদ। তা ত গিয়েছে, কিন্তু পাড়ার লোকের মুখ বন্ধ করবে কি দিয়ে এখন?

বিরজা। পাড়ার লোকের ত সব তাতেই চোখ টাটায়! কিন্তু তাই বলে লোকে আপন ছেলে-মেয়েকে দূর করে দেয় নাকি?

বিনোদ। বেশ ত রাখো সব। আজ কাঁদছো দূর করার কথায়, আর একদিন কাঁদবে, কেন দূর করিনি বলে। আমার কি? আমি আজই ধুবড়ী চলে যাচ্ছি—যে ছেলে-মেয়ে কথার বাধ্য হল না, লেখা-পড়া শিখলো না, আচার-ব্যবহারে মানুষ হল না, তাদের নিয়ে দুর্ভোগ ভোগার ইচ্ছে আমার নেই।

বিরজা। বুড়ো বয়সে তোমার কি মাথা খারাপ হল?

বিনোদ। মাথা খারাপ হয়ে থাকলে, তোমরাই করেছো তা। মানুষ আশা করে, ছেলে-মেয়ে বড় হবে, মানুষ হবে, বুড়ো বয়সে তাদের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে একটু স্বস্তি পাবে। কিন্তু আমার? আমার তিনটে ছেলে-মেয়ে —তিনটেই হল ভূত আর বাঁদর!

[গিরীনের প্রবেশ]

গিরীন। কর কোম্পানীতে যাবার কথা ছিল এগারোটায়।

বিনোদ। নাঃ, আজ আর যাবো না। আচ্ছা, আচ্ছা দাঁড়াও। হ্যাঁ, চলো যাই।

[প্রস্থান]

বিরজা। ইলু, ইলু!

[ইলার প্রবেশ]

ইলা। কি মা?

বিরজা। ছোড়দা কোথায় রে?

ইলা। ছোড়দা আর সুশীলদা গেছে মুচিপাড়ায়—সেখানে ভীষণ আগুন লেগেছে, দু'-তিনশো বাড়ী পুড়ে গেছে।

বিরজা। অ্যাঁ? কেন আমায় জানাসনি আগে? নারায়ণ রক্ষে করো! ওঁর যে রকম মতিগতি হয়েছে, শেষটা কি যে হবে, জানি না! বড়দা কি করছে?

ইলা। বড়দা এনাদির ছবি আঁকছে।

[ঐ বাড়ার বারান্দা। হাবুল ও এনা কথাবার্ত্তা কইছে। সময় দুপুর।]

হাবুল। তুমি কিছু মনে করো না এনা। বাবা একটু সেকেলে। তিনি মনে করেন, লেখাপড়া শেখার মানেই হল ব্যবসা, নয়ত চাকরি করা, আর

ছেলে-মেয়ের সম্পর্ক মানেই বিয়ে করা। তাই তাঁর হিসাবে আমি একটি পয়লা নম্বরের কুপুত্র—কাজেই বাবার অধিকার খাটাবার জন্যেই তিনি আমায় বিদ্যানিকেতন থেকে ছাড়িয়ে এনেছেন।

এনা। কিন্তু তুমি ত কচি খোকাটি নও। নিজের ব্রত ও বৃত্তি বেছে নেবার, আর জীবনের সঙ্গী করবে যাকে, তাকে যাচিয়ে নেবার সাহস তোমার থাকা উচিত।

হাবুল। তা কি আমার নেই মনে করো?

এনা। তাহলে রাতারাতি চোরের মতো বিদ্যানিকেতন থেকে পালিয়ে এলে কেন? কেনই বা তারপর আর সাড়াশব্দ দিলে না? ভাবো ত আমার দিন গেছে কি করে!

হাবুল। সবই জানি এনা। কিন্তু ঐ যে বললাম, বাবা খাটিয়েছেন তাঁর পিতৃত্বের অধিকার এবং যেহেতু আমার টাকা নেই, আর সেইজন্যেই স্বাধীন ভাবে দাঁড়াবার সামর্থ্য নেই, তাই আমি আত্মসমর্পণ করেছি সেই অধিকারের কাছে!

এনা। এতে আমার ওপর কি কোন অবিচার করা হয়নি?

হাবুল। হয়েছে নিশ্চয়ই এবং তার জন্যে আমি তোমার কাছে ত মাপও চেয়েছি এনা!

এনা। কিন্তু তাই কি যথেষ্ট? এরপর বুঝি তুমি সৌখীন অনুকম্পা দেখিয়ে আমায় বিদায় দেবে, আর আমার এই প্রতিকৃতির গায়ে মালা জড়িয়ে দিয়েই মনে করবে, আমার সম্বন্ধে তোমার সমস্ত কর্ত্তব্য শেষ হয়ে গেছে?

হাবুল। এরপরে কি করবো, কিছুই ভাবতে পারিনি এনা। আমি শুধু স্থির হয়ে আছি একটা আশা নিয়ে—হঠাৎ একটা কিছু হবে, এমন একটা কোন আকস্মিক শুভযোগ, যার ফলে অপ্রত্যাশিত ভাবেই আমরা পেয়ে যাবো বাবার আশীর্ব্বাদ।

এনা। তুমি খুব আশাবাদী সন্দেহ নেই। কিন্তু বাস্তবে যা ঘটছে, তাতে নিশ্চয় লক্ষ্য করেছো যে হাওয়া ঠিক উল্টো দিকে।

হাবুল। না এনা, অতটা হতাশ হবার মতো অবস্থা নয়। তুমি যেদিন প্রথম এসেছিলে, বাবা সেদিন থেকেই চটেছেন, কিন্তু মা'র অন্তর তুমি জয়

করেছো। তিনি যে তোমায় গ্রহণ করেছেন, তা কি তুমি বুঝতে পারো নি এনা?

এনা। তা পেরেছি, আর সেইজন্যেই এত কাণ্ডের পরও পিছু হটি নি। কিন্তু আর ত তা চলবে না! তোমার বাবা আজ কড়া হুকুম দিয়েছেন, তাঁর বাড়ী থেকে আমায় বিদায় নিতে হবে—নইলে তিনি তোমাকেও স্থান দেবেন না।

হাবুল। কৈ মা ত কিছু বলেন নি আমায়?

এনা। তোমায় বলেন নি, কিন্তু ব্যাপারটা আমায় তিনি জানিয়েছেন।

হাবুল। ও: তা, তা, এনা আমি চলে যাবো। হ্যা, চলেই যাবো—তোমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাবো। তুমি গান গাইবে, আর আমি আঁকবো ছবি—এই করে দু'জনে চালিয়ে নিতে পারবো না? এমন লোক কি কোথাও নেই, যারা এই দুটো জিনিষকে মূল্যবান মনে করবে, এর আদর করবে?

এনা। হয়ত পাববো, হয়ত আছে। কিন্তু আর একটু দূর পর্য্যন্ত একবার তাকিয়ে দেখো—সকলের আগে ঠিক করতে হবে, তোমাতে-আমাতে কি সম্বন্ধ।

হাবুল। কেন বন্ধুত্বের সম্বন্ধ, নিছক. .

এনা। পাগল! এ রকম বন্ধুত্ব এ-দেশে কেউ স্বীকার করবে?

হাবুল। তাহলে?

এনা। তোমাকে প্রমাণ করতে হবে যে তোমার ও আমার সম্বন্ধ সমাজসম্মত—মানে

হাবুল। বুঝেছি, তুমি বলছো বিয়ে করতে হবে। বেশ, তাই করবো।

এনা। কে দাঁড়াবে সেই বিয়েতে? তোমার বাবা ত ননই, আমার বাবাও না। বাবা জানেন, আমি বিদ্যানিকেতনেই পড়ছি। যখন শুনবেন তোমার পিছু-পিছু আমি তোমার বাড়ী ধাওয়া করেছি, তিনি একদম মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়বেন, তারপর আমায় দেবেন দূর-দূর করে বিদায় করে। তখন?

হাবুল। দাঁড়াও, দাঁড়াও, অত উতলা হয়ো না। মাকে বুঝিয়ে বলছি সব, মা নিশ্চয় একটা ব্যবস্থা করে দেবেন। মা আমায় খুব ভালোবাসেন

এনা—আমার সমস্ত কাজের পেছনে আছে মা'র আশীর্ব্বাদ, আমি যে ছবি আঁকি, সে-ও মা'রই উৎসাহে।

এনা। কিন্তু তিনি কি বলেছেন তা ত বললামই।

হাবুল। দূর! ও মা বলেছেন বাবার ওপর রাগ করে। আসলে মা তোমায় কিছুতেই ছাড়বেন না, দেখো তুমি।

এনা। কেন, তিনি কি জাত-ধর্ম্ম মানেন না?

হাবুল। সবই মানেন, কিন্তু আমার জন্যে মা এক দণ্ডে সব ছাড়তে পারবেন, এ ভরসা আমার আছে এনা।

এনা। তুমি নিতান্তই আর্টিষ্ট, স্বপ্ন দিয়ে সৃষ্টি করে নিয়েছো জীবনকে, জীবন আসলে স্বপ্ন নয়—এখানে কি হবে, আর কি হতে পারে, তা আগে থেকে আন্দাজ করা প্রায় অসম্ভব।

হাবুল। দেখি ত! আচ্ছা চলো মা'র কাছে।

[দু'জনের প্রস্থান।

সুশীল ও দুলুর প্রবেশ]

সুশীল। কেন ঢুকলে দুলু ঐ চালাটার ভেতর?

দুলু। তা না হলে বাচ্চা ছেলেটা পুড়ে মরতো না? পুড়েছে—তবু আশা হচ্ছে, হয়ত বেঁচে যাবে।

সুশীল। কিন্তু তুমিও যে ভীষণ পুড়েছো দুলু!

দুলু। হকগে, ও সেরে যাবে। দেখো তুমি, মা একটু হাত বুলিয়ে দিলেই ঠিক সেরে যাবে।

সুশীল। আমার কিন্তু ভীষণ লজ্জা করছে দুলু—কি মনে করবেন তিনি, যখন শুনবেন যে আমিই তোমায় মুচিপাড়ায় নিয়ে গিয়েছিলাম?

দুলু। মাকে তুমি জানো না সুশীল। মা মুখে খুব ধমকাবেন, কিন্তু ভেতরে ভেতরে খুব খুসী হবেন, যখন জানবেন যে আমরা সমস্ত লোককে আগুনের মুখ থেকে বাঁচিয়েছি! উঃ, এইখানটা বড্ড জ্বালা করছে সুশীল, উঃ বড্ড · হ্যাঁ, কি বলছিলাম?

সুশীল। মাকে একবার ডাকবো দুলু?

দুলু। না, না, ডাক্তার ত বললেন, চার-পাঁচ ঘণ্টার মধ্যেই জ্বালা-যন্ত্রণা সব কমে যাবে। হ্যাঁ, কি বলছিলাম?

সুশীল। থাক তুলু, এখন ওসব কথায় কাজ নেই।

[ইলার প্রবেশ ও সুশীলের প্রস্থান]

ইলা। কি সর্ব্বনাশ! ছোড়দা, তোমার মাথায় ব্যাণ্ডিস কেন? ও কি হাতে-পায়েও ব্যাণ্ডিস! অ্যাঁ?

তুলু। চুপ কর ইলু। একটু পুড়ে গেছে, তাতে অমন করছিস কেন? জানিস, কত লোক এই রকম পুড়েছে?

ইলা। যাকগে। তুমি কেন ওর ভেতর গেলে?

তুলু। কি বলিস ইলু? ওরা মানুষ নয়? হ্যাঁ, বাবা কোথায় রে?

ইলা। বাবা বেরিয়েছেন। জানো কে এসেছিল?

তুলু। জানি। যাবার সময় ত দেখেই গেলাম। ব্যাটা বুড়ো কি পাজি! ওর বিশ্বাস, মীরা কিচ্ছুটি জানে না, আমিই তাকে এদিকে মীরা যে আমায় রোজ দিস্তে দিস্তে চিঠি লিখেছে, তা ত জানে না। বাণীর বাঁধের ধারে দু'বছর আগে কোজাগর পূর্ণিমার রাতে সে বলে আমার গলায় নিজের গলা থেকে খুলে হার পরিয়ে দিয়েছিল।

ইলা। জানি।

তুলু। কি করে জানলি? মীরা বলেছে বুঝি?

ইলা। বাবা, মীরা সেই রকম মেয়ে নাকি? সে বলে ক্লাসের দুটি একটি মেয়ে ছাড়া কারুর সঙ্গে কথাই বলে না। আমি তার সমস্ত চিঠি পড়েছি।

তুলু। কি করে পড়লি?

ইলা। রাগ করবে না বলো? তোমার স্যুটকেস থেকে বের করে পড়েছি, মা-ও

তুলু। অ্যাঁ, মা-ও? কেন পড়লি তুই? এই কি ঠিক হয়েছে তোর?

ইলা। দূর বোকা! মাকে দেখিয়ে খুব ভালো হয়েছে। মা'র ভেতর ভেতর খুব পছন্দ হয়েছে মীরাকে। ওদের মাকে দিয়ে মা মীরার মাকে বলেও পাঠিয়েছে সব। মীরার বাবাটা আসল পাজি, কিন্তু তার মা খুব ভালো, জানিস কি বলেছেন তিনি?

তুলু। কি বলেছেন?

ইলা। বলবো না।

ঝুলু। বল ভাই—নইলে কিন্তু সুশীলকে আর এ বাড়ীতে আসতে দোব না কোন দিন।

ইলা। তাতে আমার ভারী বয়ে যাবে!

ঝুলু। ইস! তবে গ্রীষ্মের ছুটীর সময় অমন ক্যান ক্যান করে মরছিস কেন? আমি বুঝি কিছু জানিনে? বল শীগ্রী!

ইলা। বলেছেন, একদিন সুবিধে মতো মীরাকে লুকিয়ে নিয়ে আসবেন মা'র কাছে।

ঝুলু। সত্যি? কবে রে?

[সুশীলের প্রবেশ]

সুশীল। ঝুলু, শীগ্রী পুজোর ঘরে যাও, মা'র পুজো শেষ হয়েছে, তিনি তোমার গায়ে শান্তিজল না দিয়ে উঠবেন না।

ঝুলু। বলেছো মাকে? মা হয়ত খুব কাঁদবেন! চলো তুমিও।

সুশীল। আমি নিয়ে এসেছি।

ঝুলু। ওঃ, আচ্ছা।

[প্রস্থান]

সুশীল। আমার কিন্তু ভীষণ লজ্জা করছে ইলা।

ইলা। কেন বাবা রাগ করছেন বলে?

সুশীল। শুধু রাগ নয়—তিনি বলেছেন, আমি যেন আর তোমাদের বাড়ী না আসি।

ইলা। বাবা ও রকম বলেন। মা ত কিছু বলেন নি?

সুশীল। একা মা'র কথায় কি হবে?

ইলা। মা'র কথাতেই সব হবে। বাবা কি সংসারের কোন খবর রাখেন? তিনি দিনরাত্তির আছেন ব্যবসা নিয়ে। হঠাৎ কোন কথা কানে উঠলেই একেবারে ক্ষেপে যান—তারপর বুঝিয়ে-সুঝিয়ে মা'ই যা করার করেন।

সুশীল। যদি না পারেন?

ইলা। তাহলে তুমি আমায় নিয়ে যাবে। মনে নেই জ্যোৎস্না-রাতে রাণীর বাঁধে ডিঙির ওপর বসে কি প্রতিজ্ঞা করেছিলে?

সুশীল। আছে ইলা। কিন্তু...

ইলা। আমি কোন কিছু শুনবো না। ও কি, তোমার দুটো হাতেও যে ব্যাণ্ডেজ? অ্যাঁ, তুমিও পুড়ে গেছো?

সুশীল। সামান্য।

[ঐ বাড়ীর লাইব্রেরী। বিনোদবাবু ও এনা। পরের দিন সকাল।]

বিনোদ। এখন কেমন আছে মা?

এনা। দুটো পর্যন্ত খুব ছটফট করেছে—তারপর থেকেই ঘুমিয়েছে। এখন ভালোই আছে।

বিনোদ। তোমার সেবাতেই এ-যাত্রা বেঁচে গেল মা। কাল দুপুর থেকে তুমি কি শুশ্রূষাটাই না করলে।

এনা। আমি আর কি করেছি? এত বড় জীবন যিনি সৃষ্টি করেছেন, রক্ষাও তিনিই করেছেন।

বিনোদ। না মা, ঈশ্বর যে দয়া করেন, সে ত মানুষের হাত দিয়েই করেন—তুমি এসেছিলে বলেই এত বড় বিপদে আমি রক্ষে পেলাম। ছেলেটার মন বড্ড কোমল মা, পরের দুঃখ দেখলে ওর জ্ঞান থাকে না, জল-আগুন কিছু না ভেবেই ঝাঁপিয়ে পড়ে—এইবার নিয়ে তিনবার হল। বারণ ত করতে পারিনে।

এনা। বারণ করবেন না। এত বড় দুঃখের পৃথিবীতে মানুষকে যে এতটুকু শান্তি দিতে পারে, তাকে বারণ করতে নেই। আজ ছোট আছে, কাল বড় হবে—কে জানে এই দুলুই একদিন আর একটা দেশবন্ধু হবে কিনা!

বিনোদ। তাই হক মা, সেই আশীর্ব্বাদই করো তুমি।

এনা। একটা কথা·

বিনোদ। বলো মা।

এনা। আমি আজ ন'টার গাড়ীতে চলে যাবো—সকালে ঐ একটি মাত্র ট্রেন।

বিনোদ। চলে যাবে? হঠাৎ যাবে কেন মা?

এনা। আপনি ত সেই রকমই আদেশ করেছেন।

বিনোদ। পাগল মেয়ে! বুড়ো মানুষ রাগ করে কি বলেছি, সেইটাই বড় হল তোর কাছে? আর আমি যেতে দিই তোকে? আমার সেবা করবে কে তাহলে?

এনা। আমি ভেবেছিলাম আমায় আপনি পায়ে স্থান দেবেন না, আমি অন্ত্যজাত ··

বিনোদ। সব জাত ধুয়ে গেছে মা। আজ থেকে তুমি আমারি মা হলে। হাবুল আমার বড় ছেলে—বড্ড স্বপ্নবিলাসী সে, দিনরাত তাকিয়ে আছে দূরের দিকে, কোথায় কোন রং কোন রঙের সঙ্গে মিশে কি নতুন ছবির আদরা গড়ে তুলছে! তার ভার আমি তোমার হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলাম মা।

[ইলার প্রবেশ]

ইলা। এনাদি, দাদা বললে, এখনি তৈবি হয়ে নিতে—নইলে কিন্তু ন'টার আগে ষ্টেশনে পৌছুতে পারবে না।

বিনোদ। যাও মা, তুমি খোকাকে বুঝিয়ে বলোগে। ভাবুক মানুষ, ভাবে ঘা লেগেছে, অমনি ঝন ঝন করে বাজছে!

[এনার প্রস্থান]

ইলা। এনাদি যাবে না?

বিনোদ। না। হ্যাঁ, সুশীল কোথায় রে? তাকে দেখছিনে কেন?

ইলা। রাত্রে ত ছোড়দার কাছেই ছিলেন। সকালবেলা উঠে কোথায় গেলেন জানিনে।

বিনোদ। একেবারেই জানিসনে, না একটু-একটু জানিস?

ইলা। বা রে! আমি কি করে জানবো?

বিনোদ। না, তাই বলছি। সুশীলকে আমি বলেছি, মেস থেকে তার জিনিষপত্র সব নিয়ে আসতে। দোতলার ছোট ঘরটা এমনি পড়ে রয়েছে—ও সেটাতে থাকবে। তুই কিন্তু ওর পড়ার ব্যাঘাত করবি নে, এবার ওর এগজামিনের বছর।

ইলা। ছোড়দা বলেছে, সে এগজামিন দেবে না।

বিনোদ। ছোড়দা আগে সেরে উঠুক, তারপর ত এগজামিন! দেখে আয় দেখি, কি করছে সে?

[ইলার প্রস্থান। মথুরার প্রবেশ।]

মথুরা। মশায়, এসব কি? এসব আপনারা কি আরম্ভ করেছেন?

বিনোদ। কেন, কেন, হয়েছে কি?

মথুরা। আপনারা ষড়যন্ত্র করে আমার মেয়েকে বাড়ী থেকে বের করে এনে, নিজেদের হেপাজতে আটকে রেখেছেন! আপনারা কি মনে করছেন, এটা মগের মুল্লুক? আমি পুলিসের সাহায্যে এখুনি মেয়ে বার করে নিয়ে যাবো—বড়লোক বলে রেয়াৎ করবো না।

বিনোদ। আপনার কি মাথা খারাপ? আপনার মেয়েকে আমরা বের করেই বা আনবো কেন, আর আটকেই বা রাখবো কি জন্মে?

মথুরা। ন্যাকামি করবেন না! বাড়ীর ভেতর খোঁজ নিন, দেখবেন, আমার মেয়েকে আপনার স্ত্রী গ্রেপ্তার করে রেখেছেন। এ সব কি ভদ্র-লোকের কাজ?

বিনোদ। বসুন আপনি। আমি খোঁজ নিচ্ছি। এই যে সুশীল…

[সুশীলের প্রবেশ]

শোনো সুশীল, উনি বলছেন, ওঁর মেয়েকে নাকি অন্যায় ভাবে আমরা বাড়ীতে আটকে রেখেছি। খোঁজ করো ত ব্যাপারটা কি।

সুশীল। ব্যাপারটা কি বলছি। মুচিপাড়ার তল্লাটটা ওঁর—ক'জন প্রজা ওঁর খাজনা দিতে পারেনি, তাই কাল ভোর রাত্রে উনি লোক দিয়ে পাড়াকে পাড়া আগুন লাগিয়ে তাদের পুড়িয়ে মারার ফন্দী করেছিলেন। কিন্তু ওঁর মেয়ে আগে থাকতে টের পান, তিনি একটি বাচ্চা মেয়ের হাত দিয়ে লুকে একখানা চিঠি লিখে পাঠান…

মথুরা। মিথ্যে কথা।

সুশীল। চুপ করুন আপনি। সে চিঠি আমার পকেটে রয়েছে, আপনার সমুচিত শাস্তি যাতে হয়, তার জন্যে সে চিঠি আমি ম্যাজিষ্ট্রেটের হাতে দিয়ে আসবো—সেখানেই প্রমাণ করবেন, মিথ্যে কি সত্যি?

মথুরা। তার মানে?

সুশীল। তার মানে অতি সহজ। যে লোক গরীব প্রজা খাজনা দিতে না পারলে, তাদের পাড়াশুদ্ধ জালিয়ে দেয়, এমন ভয়ঙ্কর লোককে লোকালয়ে ছেড়ে রাখা যায় না।

মথুরা। কিন্তু দৈবাৎ কি আগুন লাগে না ?

সুশীল। লাগে, কিন্তু এটা যে দৈবাৎ নয়, তার প্রথম প্রমাণ আপনার মেয়ের চিঠি। যে আগুন দিতে যাচ্ছে তার নাম পর্য্যন্ত তিনি লিখেছেন। দ্বিতীয় প্রমাণ, তুলুকে খবর দিয়েছিলেন বলে, আপনি তাঁকে নির্ম্মমভাবে মেরেছেন এবং মারের যন্ত্রণায় অস্থির হয়েই তিনি পালিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছেন তুলুর মা'র কাছে, আপনার স্ত্রী নিজে এসে দিয়ে গেছেন তাঁকে। তাঁর সর্ব্বাঙ্গে আঘাতের দাগ আমি দেখেছি—তাঁকেও দাঁড় করাবো আমরা ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে।

মথুরা। আপনারা দল পাকিয়ে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন।

সুশীল। ষড়যন্ত্র! আপনার স্ত্রী, আপনার কন্যা, আপনার প্রতিবেশী প্রসন্নবাবু ডাক্তার, আপনার কর্ম্মচারী নিখিল ঘটক, আপনার মুচিপাড়ার প্রজারা, সবাই আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন ! আর একমাত্র সদাশিব পুরুষ হলেন আপনি !

বিনোদ। থাকগে বাবা সুশীল, বুড়ো মানুষ, ওঁকে অমন করে অপমান করা ঠিক নয়। তুমি ভেতরে যাও, আমি ওঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইছি।

সুশীল। আজ্ঞে, উনি মিথ্যে অভিযোগ করছিলেন, তাই আসল ব্যাপারটা জানালাম। [প্রস্থান]

বিনোদ। মথুরাবাবু, কাল যখন আপনি তেড়ে এসেছিলেন, তখন আমি ক্ষুণ্ণ হয়েছিলাম ঠিকই, কিন্তু তবু তার ভেতর কোন অসঙ্গতি দেখি নি—পুরোণপন্থী মানুষ আমরা, রাগ হতে পারে আমাদের একেলে চাল-চলনের বাড়াবাড়ি দেখে। কিন্তু আজ আপনাকে তেড়ে আসতে দেখে ঘৃণা হচ্ছে আমার। ছি-ছি, এমন পাষণ্ড আপনি ! যারা গরীব, দু'বেলা পেট ভরে খেতে পায় না, গায়ে যাদের নেই এতটুকু কাপড়, সেই হতভাগাদের কাছে খাজনা চান আপনি, আর তাই না পেয়ে তাদের পাড়া জ্বালিয়ে দেন। ইস আপনি ত দেখছি একটা নরখাদক !

মথুরা। অ্যাঁ—অ্যাঁ।

বিনোদ। আপনার তুলনায় আমার ছোটছেলে ত দেবতা। যে আগুন আপনি লাগিয়েছিলেন, সেই আগুন সে নিভিয়ে এসেছে নিজের জীবন বিপন্ন করে।

মথুরা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওরা বাঁচিয়েছে, সকলকেই বাঁচিয়েছে।

বিনোদ। ভাবুন ত আপনার মেয়ের কথা। অমন লক্ষ্মী মেয়ে—তাকে আপনি মেরেছেন! আজ যদি ওরা পুলিসে যায়, কি করে বাঁচাবেন আপনি নিজেকে?

মথুরা। আজ্ঞে আপনি—আপনি ইচ্ছে করলেই আমায় বাঁচাতে পারেন। মেয়ে ত আপনার আশ্রয়েই এসেছে, ওকে আপনি স্থান দিন—আর আমি—এই আমি হলফ করছি, মুচিপাড়ার সমস্ত বাড়ী আমি তৈরি করিয়ে দোব, তাদের এই সনের খাজনাও মকুব করে দোব। আপনি শুধু সালিসী হয়ে…

বিনোদ। এ আপনি ভয়ের দরুণ বলছেন, না সত্যিই আপনার মনের পরিবর্ত্তন হয়েছে?

মথুরা। বিনোদবাবু, মানুষ ত আমিও—ছোট ছোট ছেলে-মেয়ের এই মহত্ব চোখের সামনে দেখেও কি আমার শিক্ষা হয়নি?

বিনোদ। আচ্ছা, তাহলে আপনি আসুন। আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। ওরে হরিপদ, তোর মাকে একবার আসতে বলতো।

[মথুরার প্রস্থান]

[বিরজার প্রবেশ]

বিরজা। কি বলছো?

বিনোদ। মথুরার মেয়েকেও গ্রেপ্তার করেছো তাহলে?

বিরজা। করেছি বৈকি! ওকে পেয়েই তুলু আমার সুস্থ হয়ে উঠলো—এখন দু'জনে বসে বসে দিব্যি গল্প করছে।

বিনোদ। হাবুল কি করছে?

বিরজা। এনার ছবি আঁকছে। ওরাও বেঁচেছে তোমার ছাড়পত্র পেয়ে!

বিনোদ। আর ইলা?

বিরজা। সুশীলের সঙ্গে বসে সেতার-চর্চ্চা।

বিনোদ। বলো কি, বাড়ীতে তাহলে প্রেমের হাট!

বিরজা। জীবনে দুঃখ-কষ্ট যেমন সত্যি, এটাও তেমনি সত্যি। যে ক'দিন পারে ভোগ করে নিক ওরা। খুসী হয়ে আশীর্ব্বাদ করো তুমি।

বিনোদ। করেছি বৈকি। আমাদের বিশ্বাস আর সংস্কারের বিরুদ্ধেই ত ওরা নিলে আমাদের আশীর্ব্বাদ আদায় করে!

ধর্ম্মঘট

[তে-তলা বাড়ীর দো-তলার বারান্দা—বাড়ীর সাজসজ্জা নব্য ধরণের। স্যার ঋতেন ও জেনারেল ম্যানেজার মিঃ বি, বাসু।]

ঋতেন। চলুক না আর ক'দিন চলবে! না খেয়ে খেয়ে ব্যাটারা যখন নেংটি ইঁদুরের মতো ধুঁকতে আরম্ভ করবে, তখন আপনিই সুড় সুড় করে এসে কাজে লাগবে।

বাসু। এই মরসুমের বাজারে পুরো একটা সপ্তাহ কারখানা বন্ধ গেল—সোজা লোকসান!

ঋতেন। হক না, ধর্ম্মঘট ভাঙলেই ওভারটাইম খাটিয়ে খাটিয়ে জান মেরে দোব ব্যাটাদের। এই ক'দিনের লোকসান সুদে-আসলে তুলে নোব, তবে অন্য কাজ। কি মনে করেছে ওরা? যার টাকা আছে, তাকে কাবু করা কি এতই সোজা?

বাসু। বলা যায় না, দিনকাল বদলেছে। আজ ছোটলোকের মুখে উঠেছে বড় বড় কথা—আজ তারা নিজেদের দাবী-দাওয়া বলতে শিখেছে।

ঋতেন। ওরা কিছুই শেখেনি। ওদের মুখে এই সব সস্তা সাম্যবাদের বুলি তুলে দিয়েছে গেরস্ত ঘরের বেকার ছোঁড়ারা। তাদের জীবনে অসন্তোষের অন্ত নেই—লেখাপড়া শিখেছে, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য মান-সম্ভ্রমের দিকে লোভ আছে, কিন্তু রোজগার করতে পারে না একটি পয়সা—তাই মাথা তুলতে পারে না কোন জায়গাতেই, দায়ে পড়েই তারা হয় কম্যুনিষ্ট। মানে, আমাদের যখন কিছু নেই, তখন যাদের কিছু আছে, তাদের আমরা নিপাত করবো—উঁচু-নীচু সব চষে একাকার করে দোব। বুঝলে না? এ হল বেকার মধ্যবিত্তের আন্দোলন—চাষা ছোট লোককে ওরা নামিয়েছে এতে, কারণ জানে, হুড়োহুড়ি কাড়াকাড়ির কাজে তারা ভিন্ন উপায় নেই!

বাসু। তা ঠিক, কিন্তু দেখতে দেখতে এদের দল বেশ ভারী হয়ে উঠেছে দেশে। বুঝে হক, না বুঝে হক, চাষী-মজুররাও মেতে উঠেছে

চতুর্দ্দিকে—এমন দিনে ঠিক আগের মতো চললে হয়ত কারবার রাখা যাবে না। আমার ত মনে হয়, কিছু-না-কিছু দিতেই হবে এবার।

ঋতেন। কিছু না, এক কাণাকড়িও না। ব্যাটারা বলে, আমাদের স্কুল চাই, হাঁসপাতাল চাই, পার্ক চাই, কো-অপারেটিভ সপ চাই, পাকা কেয়াটার চাই, ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন চাই—তোমরা মনে করো, এ ওদের দাবী? ওরা জীবনে কোনদিন অনুভব করেছে এ সবের প্রয়োজন? ওদের শিখিয়েছে ঐ বয়াটে ছোঁড়ারা, আর ভাঁওতায় ভুলে ব্যাটারা মরছে ধর্ম্মঘট করে!

বাসু। যে-জন্যেই হক, ব্যবসার ত ক্ষতি হচ্ছে!

ঋতেন। তা একটু হবে বৈকি। কিন্তু বেশী দিন নয়—গরম বক্তৃতা শুনে মাথা যতই চড়ে উঠুক, পেট ভরে না। পেটের জ্বালা মেটাবার পুঁজি কি এই সব ফতো কম্যুনিষ্টদের আছে? দু'দিন পরে দেখবে, এই ক্ষুধার্ত্ত পশুর পাল নিরুপায় হয়ে ওদেরই গলায় কামড় বসাবে! সেই সুযোগের অপেক্ষাতেই আছি আমি।

বাসু। কিন্তু এবারকার ব্যাপারটা যেন ঠিক সে-রকম দেখছি না। চেষ্টা করেছিলাম গোড়ার দিকে দু'চার জন সর্দ্দারকে হাত করতে, আর তাদের দিয়ে ধর্ম্মঘট কোলাপ্স করাতে। দেখলাম, সব এককাট্টা! কম্যুনিষ্ট ছোঁড়াগুলো ওদের একদম কিনে নিয়েছে। আর ছোঁড়াগুলো এমনে যাই হক, বেশ সিন্সিয়ার, আর ডিটারমাইণ্ড!

ঋতেন। ঘোড়ার ডিম! এখনি টাকা ছেড়ে দেখো, একে একে এই সব ধুরন্ধর কম্যুনিষ্ট ল্যাজ গুটিয়ে সুট সুট করে ক্যাপিটালিষ্টদের কবলে চলে আসছে!

বাসু। সে চেষ্টাও করেছি, তাতে ফল হয়েছে উল্টো। সেদিন ত মার খেতে খেতেই বেঁচে গেলাম। ছোঁড়াগুলো ভীষণ জেদী—কুলিদের সঙ্গে এক লাগাড়ে উপুস করেছে, আর তিনটে কারখানায় সমানে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছে!

ঋতেন। হবে, হবে, অত নার্ভাস হলে চলবে কেন? বক্তৃতার জোর ক্রমেই কমে আসবে, তখনি কৌশলে চাপ দিতে হবে। তোমরা শুধু নজর রেখো খবরের কাগজ গুলোর ওপর—তারা যেন আবার বাঘের পেছনে ফেউ-এর মতন ওদের পেছনে মানবতার হুক্কাহুয়া তুলতে আরম্ভ না করে। তাহলেই কিন্তু আমরা পাব্লিকের গুড উইল হারাবো!

বাসু। সে ভয় নেই। ঘোষালকে পাঠিয়েছি নিউজ পেপার ম্যাগনেটদের কাছে—সেই সঙ্গেই মোটা মোটা এডভার্টিজমেন্ট পাঠিয়েছি, তারা কিছু লিখবে না।

ঋতেন। কিচ্ছু বিশ্বাস নেই এই কাগুজে লোকগুলোকে। ওরা আসলে আমাদেরি মতো মহাজনী কারবার ফেঁদেছে, কুলি-কাবারীকে এক্সপ্লয়েট করেছে ঠিক একই রকম করে, কিন্তু মানবতার দোহাই পাড়তে, আর গণতান্ত্রিক অধিকারের ধুয়ো তুলে চাষী-মজুর ক্ষেপাতে ওদের জুড়ী নেই! এই ওদের ব্যবসা!

বাসু। সেই জন্যেই ত আমি সিধে মালিকদের ধরেছি। তারা একটু আধটু ম্যাস-এজিটেশন পপ্যুলারিটির খাতিরে সমর্থন করলেও, আসলে ক্যাপিটালিষ্ট ইনটারেষ্ট কখনো নষ্ট হতে দেবে না। আর এখনকার কাগজ ত চালায় তারাই, সম্পাদকরা ত চাকুরে লোক!

ঋতেন। তা ঠিকই। আচ্ছা, কৈলাসকে যে তালিম দিয়ে ছাড়লাম ধর্মঘটীদের মধ্যে—সে কি করলে? পারলে ব্যাটাদের ডিমরালাইজড্ করতে?

বাসু। মনে ত হয় না। লছমন, বিষণ, কালু সেখ—এই সব ছিল আমাদের ক্রিচার, এর আগে যত বার লেবার আনরেষ্ট হয়েছে, তারাই ভেঙে দিয়েছে শেষ পর্য্যন্ত। কিন্তু এবার দেখছি, তারাও বিগড়েছে।

[নিনার প্রবেশ]

নিনা। বাবা, কুলি-ধাওড়ার মেয়েরা ছেলেপুলে নিয়ে দলে দলে এসে দরজায় জড়ো হয়েছে। আজ ক'দিন ধরে বেচারীরা কিচ্ছু খেতে পায় নি!

ঋতেন। তাদের মদ্দগুলো বেড়াচ্ছে ইনক্লাব জিন্দাবাদ হেঁকে, আর মাগীগুলো এসেছে দানা-পানি চাইতে? দূর করে দাও, বলে দাও, ঐ সব ছেঁচড়া কম্যুনিষ্টদের কাছে যেতে।

নিনা। বড্ড গোলমাল করছে ওরা। এত টুকু-টুকু বাচ্চা সব, কাঁদছে খিদের জ্বালায়!

ঋতেন। কাঁদছে? কেন কুলি-ধাওড়ার সিউয়ারে কাদা নেই? বলে দাও হারামজাদীদের, সেই কাদা দিয়ে বাচ্চাগুলোর মুখ বন্ধ করে দিতে।

বাসু। স্যার···

ঋতেন। না, না, কোন কন্সিডারেশন হতে পারে না ম্যানেজার। ওদের

পেটে দানা পড়লে ধর্ম্মঘট অনন্তকাল ধরে চলবে। এই জায়গায় আমাদের একটু শক্ত হতে হবে।

বাসু। আমি বলছিলাম এক্সপিডিয়ান্সীর কথা। আর দু-এক দিন গেলেই এই সব ছেলেমেয়ে মরতে সুরু করবে, তাহলে কিন্তু কুলির দল একেবারে ক্ষেপে যাবে—তখন কারখানায় আগুন জ্বলবে, পথে-ঘাটে ষ্টাফ খুন হতে আরম্ভ হবে।

ঋতেন। হাঃ হাঃ হাঃ, এ কি রাশিয়া পেয়েছো? আর করুক না সেই রকম কিছু, তাই ত চাই আমি। তাহলে একটা অজুহাত পাই পুলিস ফোর্স ডাকবার—একেবারে পিটিয়ে নির্ম্মূল করে দিই এই গণ-দেবতার অভ্যুত্থান!

বাসু। তাহলে ত কারবারও যাবে সেই সঙ্গে।

ঋতেন। তুমি চাও ম্যানেজার, ওদের বেয়াড়া দাবী আমাদের মেনে নিতে হবে? লেবার ষ্টাফের জন্যে আমরা যা করেছি, তার চেয়ে ভালো ব্যবস্থা কোন জায়গাতেই দেখতে পাবে না। মেকেঞ্জি কমিশন পর্য্যন্ত বলে গেছে, Ideal Organisation—এতে যদি ওদের মন না ভরে ত আমি নাচার! সত্যিই ত আর ওদের আমি ওযার্কিং-পার্টনার করে নিতে পারি না!

[বাইরে প্রচণ্ড হৈ-হৈ—খানা দাও, রোটি দাও, বাচ্চা লোককো দুধ দাও!]

নিনা। বাবা!

ঋতেন। কি রে? কষ্ট হচ্ছে বুঝি খুব? বয়স কম, একটু হবে বৈকি! ও কিছু নয়, মনে কর ত দুনিয়ার কত কোটি লোক ঠিক এই সময় না খেতে পেয়ে হাহাকার করছে! তাদের সঙ্গে ওদের তফাৎ কি?

নিনা। না বাবা, তুমি ওদের মেয়েগুলোকে কিছু খেতে দাও। অন্তত ছোট ছেলেমেয়ে গুলোকে বাঁচাও। আহা বেচারীরা, কত কষ্টই হচ্ছে!

ঋতেন। এ কি ছেলে-খেলা রে পাগলী? এ হল দু-পক্ষের জীবন-মরণের লড়াই। আজ যদি ওরা হাতে ক্ষমতা পায়, আমাদের পিষে মারবে—কাজেই আমাদের বাঁচতে হলে, ওদের পায়ের নীচে দাবিয়ে রাখতেই হবে।

নিনা। কচি ছেলেমেয়ের...

ঋতেন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সকলের সম্বন্ধেই এক কথা। এই শয়তানের চাবাগুলোকে একটু চাপ দিলে ধাড়ীগুলো আপনা থেকেই কাবু হবে।

নিনা। না বাবা, তোমার পায়ে পড়ি।

ঋতেন। ছেলেমি করিস নে নিনি, তোর এ সব ব্যাপারের মধ্যে আসার দরকার কি? যা তুই এখান থেকে—যা করতে হয়, আমি নিজেই করছি।

[নিনার প্রস্থান]

ম্যানেজার?

বাসু। আজ্ঞে স্যার?

ঋতেন। তুমি দেউড়িটা গার্ড করতে বলোগে ভালো করে—সেই সঙ্গে বাহাদুর, ডোমন, ওসমান, আর নেগীকে বলোগে ওপর থেকে বেটাদের গায়ে হর্দম জল ঢালতে। হতভাগা কুকুরের পাল—ওদের মুগুরের ব্যবস্থা ভালো করেই করতে পারি, তবে কিনা নিতান্তই···

[বাইরে তুমুল চীৎকার ও হট্টগোল। থেকে থেকে ইনক্লাব জিন্দাবাদ! আর সেই সঙ্গে বহু জনের সম্মিলিত কণ্ঠে গান]

আমাদের শ্রমে তুলে পাথর,
তোমরা বানাও উঁচু পাচীর।
আমাদের নেই ভাত-কাপড়,
ঘরে আলো-হাওয়া গরহাজির।
চৌপর দিন আমরা খাটি,
মেহনতে হাড় করছি মাটি,
তোমরা আরামে মুনাফা কামাও,
ফাঁদো কারবার কারসাজীর॥

ঋতেন। বটে, বটে! আবার গানও জোগাড় হয়েছে হারামজাদাদের! আচ্ছা, আচ্ছা, দিচ্ছি ঐ হাঁ-করা মুখে বন্দুকের কুঁদো পুরে—আর দুটো দিন দাঁড়া ব্যাটারা! কৈ, গেলে না তুমি? যাও। এই বাহাদুর, ডোমন!

বাসু। স্যার, ওপন ভায়োলেন্স না করাই ভালো। আমি বলি কি...

ঋতেন। কিচ্ছু না, কিচ্ছু না। যাও তুমি, যায় আমার কারবার যাবে।

[ম্যানেজারের প্রস্থান। বাইরে তুমুল কোলাহল, গান ও সেই সঙ্গে ইনক্লাব জিন্দাবাদ!]

[তে-তলার ড্রইং রুম। স্যার ঋতেনের জ্যেষ্ঠপুত্র প্রণবকুমার
ও শ্রমিক-নেতা সন্তোষ মজুমদার।]

প্রণব। আপনাকে আমি বন্ধু বলে মনে করেছিলাম। আমার বাড়ীতে, কাজ-কারবারে, সর্ব্বত্র আপনাকে তাই অবাধে প্রবেশ করতে দিয়েছিলাম!

সন্তোষ। এবং ভেবেছিলেন, এই সুলভ উদারতার জাল ফেলেই শত শত কেরানী ও সহস্র সহস্র মজুরের মতো আমাকেও গেঁথে তুলেছেন!

প্রণব। তাতে আমার স্বার্থ? কেরাণী বা মজুরদের হাতে রাখা হয়ত আমার দরকার—তারা আমার ব্যবসার চাকা, কিন্তু আপনি ত সাহিত্যিক!

সন্তোষ। শুধু ব্যবসায়ী হলে আমাকে আপনার কোন দিনই দরকার হত না। কিন্তু আপনার যে আবার এরি সঙ্গে আছে অন্য একটি বাতিক!

প্রণব। বাতিক?

সন্তোষ। বাতিক ছাড়া কি? রাজনীতি, অর্থনীতি, সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান সব বিষয়ে প্রাজ্ঞতা দেখানোর লালসা আছে, অথচ সামর্থ্য নেই, কাজেই বক্তৃতা, প্রবন্ধ, অভিভাষণ, এসব লিখে দেবার জন্যে আমাদের মতো বিত্তহীন কোন সাহিত্যিককে আপনার দরকার আছ বৈকি!

[গোমস্তা এসে একটি চেকবুক দিলে, তারপর নমস্কার
করে বেরিয়ে গেল।]

প্রণব। দেখুন, এই ধরণের সেক্রেটারিয়েট ওয়ার্ক পৃথিবীর অনেক বড় সাহিত্যিকই করে থাকেন। এ এক রকম জার্ণালিজম বৈ ত নয়, আর জার্ণালিজম জিনিষটাকে এ-যুগের ক্যাপিটালিষ্টরা পেড লেবার হিসাবে কিনে নিয়েছেন, এ ত জানেনই!

সন্তোষ। সেই জন্যেই ত বলছি, আপনাদের সঙ্গে আমাদের মাত্র একটাই সম্বন্ধ হতে পারে, সে হল প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধ—বন্ধুত্বের দোহাই দিচ্ছেন, ওতেই আমার আপত্তি!

প্রণব। এ আপনার ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স! প্রতি মুহূর্ত্তেই আপনার মনে হচ্ছে, বুঝি আপনাকে এক্সপ্লয়েট করার জন্যে আমরা ফাঁদ পেতে বসে আছি! এই যে আপনি আমার মা, আর বোনের সঙ্গে এতটা ঘনিষ্ট হয়েছেন, বা আমাদের ফ্যামিলির এক জন বলেই মনে করে থাকে সকলে আপনাকে, এর ভেতর কি আপনি সত্যিকার একটা আন্তরিকতার পরিচয় পান নি?

সন্তোষ। বলেছি ত, এ-ও আপনাদের একটা কৌশল এবং এ কৌশলটা আপনার দরকার হয়েছিল শুধু নেতৃত্ব করার বাতিক ছিল বলে।

প্রণব। এটা আপনার সঙ্কীর্ণতা—মাপ করবেন, এ ছাড়া আর কোন জাস্টিফিকেশনই হয় না এর। আমি মনে করেছিলাম, প্রতিভাবান লেখক আপনি—আপনাকে একটু আর্থিক স্বাচ্ছল্য দিতে পারলে, তাতে হয়ত আপনার এবং সাহিত্যের কল্যাণই করা হবে। যাতে সেই সাহায্য নিতে আপনার সঙ্কোচ না হয়, তার জন্যেই তার বদলে আপনাকে দিয়ে আমি কতকগুলো প্রবন্ধ লিখিয়ে নিয়েছি।

সন্তোষ। যার লেখকরূপে আপনি অজস্র করতালি পেয়েছেন এবং জ্ঞানী গুণী মনস্বী বলে দেশের ছোকরা-মহলে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন! আপনি কি জানেন না যে এর চেয়ে বিশ্রী ভাবে শোষণ কোন সাহিত্যিককে আর করা যায় না? এই রচনা গুলোর লেখকরূপে আমি যদি দেশের সাম্নে উপস্থিত হতাম!

প্রণব। আহা, এ ত এক জাতের ক্লেরিক্যাল ওয়ার্ক—এর জন্যে পিছু ফিরে তাকানোই আপনার ভুল। ধরুন না কেন, ক্যাশ বুক, নয়ত লেজার লিখেছেন এতদিন ধরে।

সন্তোষ। ঐ যে বললাম, আপনি বুঝবেন না কেরাণীগিরির সঙ্গে এ কাজের তফাৎ কোথায়, কোথায় লেখকের বেদনা! কিন্তু থাক সে-কথা—কি জন্যে ডেকেছিলেন আমায়?

প্রণব। হ্যাঁ, আপনি আমাদের ফ্যামিলিতে মিশে অনেক কিছু বিজনেস সিক্রেট জেনেছেন আমাদের, যা ক্যাপিট্যাল করে আজ আপনি আমাদের কারখানা গুলোতে লেবার-এজিটেশন বাধিয়ে দিয়েছেন, এ কি ঠিক করেছেন?

সন্তোষ। বেঠিক কি করেছি বুঝি না। কোটি কোটি টাকা কামাচ্ছেন আপনারা এই সব কারবার থেকে, কিন্তু যাদের শ্রম ভাঙিয়ে তা করছেন, তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে আপনাদের এতটুকু মাথাব্যথা নেই! তারা দাবী করলে, আপনারা যেমন করে পারেন, তাদের মুখ বন্ধ করে দিতে যান—এর ভেতর আমি কোন মনুষ্যত্ব দেখি না! এই অমানুষিকতার ষড়যন্ত্র আমি ভাঙতে চাই।

প্রণব। দেখুন, জীবন-যাপনের ষ্ট্যাণ্ডার্ড সকলের এক রকম নয়। আমাদের ষ্ট্যাণ্ডার্ড দিয়ে আপনারা ওদের অবস্থার বিচার করছেন, তাই আপনাদের মনে

হচ্ছে, না জানি ওরা কত কষ্টে আছে! কিন্তু সত্যি ওদের কোন অসন্তোষ নেই, একটা কৃত্রিম অসন্তোষ সৃষ্টি করেছেন আপনারা, আর ওদের করেছেন তারি বাহন!

সন্তোষ। বুঝলাম, ওদের জীবন-যাপনের মান অত্যন্ত নীচু এবং ওরা নিজেদের অবস্থা ভালো কি মন্দ তা বোঝে না, এ-ও স্বীকার করলাম, কিন্তু ওদের সেই অজ্ঞানতা আর অসহায়তার সুযোগ নেওয়াই কি তাই বলে হবে মানবোচিত ব্যবস্থা? ওদের ঠিক আমাদের স্তরে উঠে আসবার সুবিধা দিয়ে দেখা দরকার নয় কি যে ওরা প্রাকৃতিক ভাবেই···

প্রণব। আঃ, আপনি অন্য দিকে চলে যাচ্ছেন! কি করলে কি হতে পারে সে এক কথা, আর আসলে কি আছে, সে এক কথা। যা আছে তাই নিয়ে বিচার করুন—এই যে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক-মজুর, এরা যদি আমাদের অধীন থেকে কল-কারখানা না চালায়, তাহলে ওয়ার্কার পাওয়া যাবে কোথায়?

সন্তোষ। কল-কারখানা ওরাই চালাবে, কিন্তু আপনাদের অধীন থাকবে কেন? কেন ওরাই মালিক হবে না এ সবের এবং মানুষ হিসাবে আপনাদের সঙ্গে সমান অধিকারই বা ভোগ করবে না কেন?

প্রণব। উত্তর অতি সহজ। যেহেতু এ দেশ ক্যাপিটালিষ্ট শাসিত এবং কম্যুনিষ্ট নয়!

সন্তোষ। আমরা সেই কম্যুনিজমই আনতে চাই।

প্রণব। বেশ কথা। যেদিন পাববেন, সেদিন আমরা আপনা থেকেই সরে পড়বো। কিন্তু জানবেন, সে জন্যে এই ধর্ম্মঘটের তুবড়ী-বাজী ছোটানোই যথেষ্ট নয়—এর চেয়ে অনেক বড় কাজ করতে হবে। যাকগে, আপনার সঙ্গে তর্ক করতে চাইনে আমি। শুনুন আপনাকে বলি—বাবা যাই বলুন, আমি ওয়ার্কারদের ন্যায়সঙ্গত দাবীগুলো সম্বন্ধে বিবেচনা করবো, কিন্তু তার আগে ধর্ম্মঘট উইথ-ড্র করতে হবে।

সন্তোষ। কি কি সর্ত্তে?

প্রণব। সে সব কথা পরে। এখন যা বলতে চাই—আপনি বা আপনাদের অন্যান্য কমরেড যাঁরা আছেন, আপনারা একটু সরে দাঁড়ান, দু'দিনেই দেখবেন ধর্ম্মঘট ভেঙে পড়লো—এই সব ভেড়ার পাল তখন হুড়মুড় করে এসে দাঁড়াবে আমাদের দরজায় এবং কোন সাম্যবাদের বুলি আওড়াবে

না, বলবে, হুজুর মা-বাপ! এ হবেই, আমি ওদের পাল্‌স্‌ চিনি ত! আমাদের সেই ফেবারটুকু করার জন্যে আমি আপনাদের, ইফ ইউ ডোণ্ট মাইণ্ড, বেশ কিছু করে·· কৈ কৈলাস? এসো!

[কৈলাসের প্রবেশ]

কৈলাস। ব্যাটারা বড় উৎপাত করছে স্যার। ইলেকট্রিক লাইন, টেলিফোন লাইন, আর জলের পাইপ নষ্ট করে দিয়েছে, মোটরগুলো ভেঙেছে—বলতে গেলে এখন আমরা ঘেরাও হয়ে পড়েছি।

প্রণব। আচ্ছা, দাঁড়াও একটু। হ্যাঁ, যা বলছিলাম—আপনাদের প্রত্যেককে আমি···

সন্তোষ। ধন্যবাদ। আপনার এই বদান্যতা শ্রমিকদের মধ্যে বণ্টন করলেই আমার বোধহয় বেশী ভালো করবেন।

প্রণব। বলেছি ত ওদের সম্বন্ধে কিছু করবোই আমি। কিন্তু তার আগে আপনাদের সঙ্গে একটা ফ্রেণ্ডলি বোঝপড়া করতে চাই।

সন্তোষ। দেখুন প্রণব বাবু, এ পর্য্যন্ত অনেক চেষ্টাই করলেন এ জন্যে, আর কেন?

কৈলাস। স্যার যা বলেছেন শুনুনই না। ওঁর হাত খুব দরাজ, মশায়দের বেশ কিছু প্রাপ্তি হয়ে যাবে।

সন্তোষ। স্যারের বচনামৃত পান এবং তার দরুণ দরাজ হাতের দক্ষিণা লাভ ত মশায়দেরই একচেটে। আর অংশীদার বাড়াতে চান কেন?

কৈলাস। তার মানে?

সন্তোষ। তার মানে মশায় হয়ত বুঝেছেন।

কৈলাস। ওঃ আমরা মানুষই নই, না? আমরা আপনাদের কার্ল মার্ক···

সন্তোষ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, প্রায় হয়ে এসেছে—বলুন, বলুন, কার্ল মার্কস···

কৈলাস। আরে, যাও, যাও হে, তোমাদের মতো কম্যুনিষ্টি না গুষ্টির পিণ্ডি কি বলো তোমরা, ও আমরা ঢের দেখেছি। বয়েস ত আর কম হল না!

প্রণব। থামো কৈলাস। হ্যাঁ, বাবাকে খবর দিয়েছো তুমি?

কৈলাস। দিয়েছি বৈ কি। তিনি রেগে একেবারে আগুন হয়ে গেছেন। সত্যি স্যার, ব্যাটারা বড় বাড় বাড়িয়েছে!

প্রণব। আচ্ছা, তুমি নীচে যাও কৈলাস। আমি যাচ্ছি একটু পরে, শুনবো সব। হ্যাঁ, শুনুন সন্তোষ বাবু, আপনারা যে ভাবছেন, আপনাদের শ্রমিক শাসনতন্ত্র এলো বলে—সেটা নিতান্তই ছেলেমি জানবেন। এখনো ঢের দিন ক্যাপিটালিজমই বহাল থাকবে, আর সেই জন্যেই আপনাদের মধ্যবিত্তদের চাষী-মজুরের দলে না গিয়ে, আমাদের দলে থাকাই ভালো!

[কৈলাসের প্রস্থান]

সন্তোষ। তা ত বটেই—আমরা মাঝখানকার স্তরটা যদি সরে যাই, তাহলে ওদের সঙ্গে আপনাদের সংঘর্ষটা জোর হবে এবং তাতেই আপনারা সাবাড় হয়ে যাবেন। কাজেই আপনাদের প্রাণপণ চেষ্টা,ঘুষ দিয়ে, লোভ দেখিয়ে আমাদের স্তরটা টিঁকিয়ে রাখবার। আমরাই যে আপনাদের মৎলব সিদ্ধির প্রধান অস্ত্র! কিন্তু সে আর হবে না প্রণব বাবু—এই সমাজে ভাঙন ধরেছে, বেকার-সমস্যা আর অবিবাহ এদের হু-হু করে টেনে নিয়ে চলেছে একেবারে শ্রেণীহীন হতভাগাদের মধ্যে, সুতরাং বৃথাই আপনারা ফাঁদ পাতছেন এদের ধরবেন বলে।

প্রণব। আমাদের জন্যে নয়, দেশের কালচার বাঁচাবার জন্যেই এই সম্প্রদায়টার বেঁচে থাকা দরকার, এরাই ত দেশের থট-লিডার।

সন্তোষ। বটে? তাই বিশ্ববিদ্যালয়, কর্পোরেশন, কংগ্রেস, সংবাদপত্র, সব চলেছে আপনাদের স্বার্থের ইঙ্গিতে—আর নির্ব্বোধ আমরা মনে করছি, বুঝি আমরাই চালাচ্ছি। আমরা আপনাদের সৌভাগ্য-রথের ক্যোচম্যান —কোথায় আমাদের লীডারশিপ? ওসব বাজে কথা থাক প্রণব বাবু, ধর্ম্মঘটীদের সম্বন্ধে সুবিবেচনা করুন, এই আমার অনুরোধ। বেচারারা অনাহারে, দুশ্চিন্তায়, অত্যাচারে সারা হয়ে যাচ্ছে—বেশী নয়, ন্যায়সঙ্গত ইনক্রিমেন্ট দিলেই ওরা সন্তুষ্ট হবে।

প্রণব। বলেছি ত আপনাকে—আগে ধর্ম্মঘট ভাঙুক ওরা, নইলে হতে পারে না কিছুই, আমরা নত হবো ওদের কাছে, এ আমাদের কুষ্ঠিতে লেখে না।

সন্তোষ। তবে জেনে রাখুন প্রণব বাবু, ধর্ম্মঘট ভাঙবে না। আমাদের কিছু নেই বটে, কিন্তু যাদের আছে, তারাই কেউ কেউ নিয়েছে ওদের অন্ন জোগানোর ভার। দেখেছেন আজ থেকে আর হাঙ্গার-মার্চ্চ?

প্রণব। বলেন কি? কে নিলে সে ভার?

[নিনার প্রবেশ]

নিনা। বড়দা, বৌদির ফিট হয়েছে, শীগ্রী এসো।

প্রণব। সে কি! হবে না? শিবরাত্রের উপুস করতে বারণ করেছিলাম তখনি! যাচ্ছি, হ্যাঁ, তুই সন্তোষ বাবুকে একটু চা খাওয়া!

[প্রস্থান]

সন্তোষ। একদিন না খেলে নিজের স্ত্রীর ফিট হয়—আর ওরা? ওরা মানুষের স্ত্রী নয়?

নিনা। কি বললেন বড়দা?

সন্তোষ। যা বলেছিলাম তোমাকে। টাকা, শুধু টাকা দিয়ে আমায় কিনে নেবেন।

নিনা। হুঁ!

[একতলার বৈঠকখানা। স্যার ঋতেন এবং মিঃ বাসু।]

ঋতেন। ইস, আমার মাথা ফাটিয়ে মরতে ইচ্ছে করছে!

বাসু। কি করবো বলুন? বড়বাবু ওয়ার্কারদের সঙ্গে এগ্রিমেণ্ট সাইন করে, আমায় খাড়া অর্ডার দিয়ে দিলেন—আমি হুকুমের চাকর, কারখানা খুলতে বলে দিলাম।

ঋতেন। কি কি টার্মে এগ্রিমেণ্ট হল?

বাসু। তিনটে ওয়ার্কসপে ইউনিয়নের তিনটে ব্রাঞ্চ থাকবে, হেড-অফিসে থাকবে একটা সেণ্ট্রাল ওয়ার্কার্স কমিটি—তাতে লেবার অরগানাইজেশনের এক জন প্রতিনিধি এবং ক'জন ওয়ার্কার-মেম্বর থাকবে। এদের সঙ্গে পরামর্শ না করে কোন ওয়ার্কারকে তাড়ানো যাবে না। তারপর ওদের কোয়াটার্স-এর ইমপ্রুভমেণ্ট করতে হবে, ওরা এনুয়্যাল ডিভিডেণ্ড্ পাবে, ওদের···

ঋতেন। থাক, আর শুনতে চাইনে। সবশুদ্ধ জড়িয়ে বুঝছি, কারবার কোলাপ্স করানোর ব্যবস্থা হয়েছে।

বাসু। আজ্ঞে, বড়বাবু ক'দিন ধরে হিসাব-কিতাব পরীক্ষা করে

দেখেছেন যে গত দু-বছর আমরা যে এক্সট্রা-প্রফিট ট্যাক্স দিয়েছি, সেটা বেঁটে দিলেই এই খরচা কুলিয়ে যাবে—এতে কোম্পানীর নেট আয়ে হাত পড়বে না।

ঋতেন। ননসেন্স! তা না হতে পারে, কিন্তু এই যে ছোট লোকের দাবীর কাছে কোম্পানীর মাথা হেঁট করলো, এর শেষ কোথায় জানো? এরা আমাদের ক্ষমতা বুঝে নিলে—এবার দফায় দফায় বায়না ধরবে এবং কোম্পানী তছরূপ হবার আগে কিছুতেই আর ছাড়বে না।

বাসু। সেটা ভাববার কথা বৈকি!

ঋতেন। কিন্তু আমি জানতে চাই, হঠাৎ কি এমন ব্যাপার হল যে এগ্রিমেণ্ট না করে তোমাদের চললো না? বাইরে খবরের কাগজের মুখ বন্ধ করে, ভেতরে ব্যাটাদের দানাপানি বন্ধ করে, আমরা যে ভাবে ওদের কোণ-ঠাসা করে এনেছিলাম, তাতে ধর্ম্মঘট আর দু'দিনও টিঁকতো না। তখন আপনিই ওরা বাপ-বাপ করে এসে কাজে লাগতো—আর সেই ফাঁকে আমরা ওদের দিতে পারতাম প্রচুর শিক্ষা।

বাসু। কি জানি, বড়বাবু কি মনে করলেন। তিনি এসিষ্টেণ্ট ডিরেক্টর!

ঋতেন। আর তুমি জেনারেল ম্যানেজার নও? তুমি কেন বাধা দিলে না? অন্তত আমায় কেন জানালে না? তোমারও গোড়া থেকেই সায় ছিল!

বাসু। আজ্ঞে স্যার, আমি দেখলাম আপনার বাড়ীর পাছ দোর থেকে বস্তা বস্তা আটা আর ডাল-চাল কুলি ধাওড়ায় চলেছে—আর আপনার কন্যা নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তাই বেঁটে দিচ্ছেন—এরপর যখন বড়বাবুর অর্ডার পেলাম, তখন আমার আপনা থেকেই মনে হল, আপনারা ধর্ম্মঘট কল-অপ্ করে নিয়েছেন।

ঋতেন। আচ্ছা যাও তুমি। হ্যাঁ, সন্ধ্যের সময় এসো আর একবার—কথা আছে। [বাসুর প্রস্থান। জলযোগের সরঞ্জাম নিয়ে ভৃত্যের প্রবেশ।] যা, যা, ওসব নিয়ে যা, এখন খাবো না কিছু। হ্যাঁ, দিদিমণিকে পাঠিয়ে দে ত একবার এখুনি!

[ভৃত্যের প্রস্থান।

নিনার প্রবেশ।]

নিনা। আমায় ডাকছিলে বাবা?

ঋতেন। হ্যাঁ, তুমি কার হুকুমে বস্তা বস্তা আটা আর চাল-ডাল কুলি-খোলায় নিয়ে গিয়েছো ?

নিনা। মা আমায় বলেছিলেন নিয়ে যেতে।

ঋতেন। মা ? আমি বাড়ীর মালিক, না তোমার মা মালিক ?

নিনা। আমি ত জানি, তোমরা দু'জনেই মালিক।

ঋতেন। না। আজ থেকে জেনে রাখো, আমি মালিক—আর তুমি বা তোমার মা আমার অধীন, তোমাদেব অন্নবস্ত্র যা-কিছু সবই দিচ্ছি আমি—আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমাদের একটি খড়ও সবাবার অধিকার নেই।

নিনা। তুমি আর বড়দা যখন কিছুতেই ওদের খাবার দিলে না, তখন মা-ও কুলিদের সঙ্গে উপোস আরম্ভ করলেন—একে একে সাত দিন উপোস করেছেন, তখন আমিই বললাম মাকে একটা ব্যবস্থা কবতে।

ঋতেন। কেন বললে, কার হুকুমে বললে ?

নিনা। নিজেব বিবেকের তাগিদে।

ঋতেন। বটে ? এত আস্পর্দ্ধা হয়েছে তোমাব ? আমি যেটা না বলে দিয়েছি, তাই কবতে সাহস করো তুমি ?

নিনা। মেয়ে হলেও আমি ত মানুষ বাবা।

ঋতেন। না, আমি তোমায় মানুষ বলে মনে করি না।

নিনা। তাহলে যে আমায় মানুষ বলে মনে করে, তাব কাছেই আজ থেকে আমায় চলে যেতে হবে বাবা।

ঋতেন। স্বচ্ছন্দে। কিন্তু জানতে পাবি কি, কে সেই মহাপুরুষ ?

নিনা। নিশ্চয়—আমার স্বামী।

ঋতেন। স্বামী ?

নিনা। হ্যাঁ, স্বামী। বড়দা যাকে তাঁর কলমচী বলে মনে করতেন, তুমি মনে করতে এ-বাড়ীর একটি আপোস্তু বলে, সেই সন্তোষ মজুমদার আমার স্বামী। আজ এক বছর আমরা বিয়ে করেছি, আর এক বছর ধরে চেষ্টা করে তবেই এই ধর্মঘটটা সফল করতে পেরেছি।

ঋতেন। বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও, এক্ষুনি আমার বাড়ী থেকে। এ রকম মেয়ের মুখ দেখবো না আমি।

[সন্তোষ ও প্রণবের প্রবেশ]

প্রণব। বাবা, সন্তোষের সঙ্গে তোমার আলাপ হয়নি বোধহয়? চমৎকার ছেলে ও—যেমন বিদ্বান, তেমনি উঁচু অন্তঃকরণ।

ঋতেন। হ্যাঁ, সে পরিচয় ভালো করেই পেয়েছি, যেটুকু বাকী ছিল এই মাত্র পেলাম। তা বেশ, বেশ! আমি শুধু একটা কথা বলতে চাই—ও হল বড়লোকের মেয়ে, ওকে প্রলুব্ধ করা যত সহজ হয়েছে, প্রতিপালন করা তত সহজ হবে কি? তখন কিন্তু আমার কাছে কাণাকড়িও প্রত্যাশা করা চলবে না!

নিনা। কম্যুনিষ্ট কোনদিন ধনীর কাছে দয়া প্রত্যাশা করে না বাবা।

ঋতেন। না করলেই ভালো। সে-কালের ছেলে-মেয়েরা করতো কৌমার্য্যের আস্ফালন—তারপরে হঠাৎ একদিন ঘাড়মুড় ভেঙে পড়তো রক্ত-মাংসের গহ্বরে। এ-কালে হয়েছে কম্যুনিজম-এর আস্ফালন—এরও পরিণাম কেরাণীগিরি। সেই দিনের কথাটা মনে রেখো শুধু!

সন্তোষ। যে আজ্ঞে। আমরা কি তাহলে এখন যেতে পারি?

ঋতেন। অনায়াসে। না দাঁড়াও! এই, ওরে আমার হাত-বাক্সটা নিয়ে আয় ত!

সন্তোষ। মাপ করবেন, আমরা কোনদিন ভিক্ষা নিই না! সামান্য কিছু উপার্জ্জন করার শক্তি আমাদের উভয়েরই আছে, তাতেই এক রকম করে চলে যাবে।

[বাক্স নিয়ে ভৃত্যের প্রবেশ]

ঋতেন। এই নাও, তোমার নামে যে ব্যাঙ্কের টাকাটা আছে, তার খাতা।

নিনা। ও টাকা ত তোমার। লক্ষ লক্ষ হতভাগার রক্ত চুঁইয়ে জমানো এই টাকা আমি নোব না বাবা। এমন কি, তোমার দেওয়া গয়নাগুলো পর্য্যন্ত আমি রেখে এসেছি ওপরের ঘরের দেরাজে—শুধু এক-কাপড়ে আমি চলে যাচ্ছি, কিছু নিয়ে যাচ্ছিনে আমার সঙ্গে এ-বাড়ীর!

ঋতেন। কিন্তু কি অপরাধে?

নিনা। অপরাধ আমাদেরই, বাবা। আমরা এ-যুগে জন্মে দেখতে পেলাম, গুটি কতক মানুষ শুধু টাকার জোরে লক্ষ লক্ষ মানুষকে বিনা অপরাধে পায়ের তলায় দাবিয়ে রেখেছে! সেই হতভাগ্যদের সঙ্গে কোথায়

জানিনা, মনে হল, আমাদেরও যোগ আছে—তাই ইচ্ছা করেই নেমে এলাম তোমাদের হাতীর দাঁতের দুর্গ থেকে একেবারে তাদের মধ্যে। তোমরা হচ্ছো এ-যুগের ব্রাহ্মণ, আর তারা শূদ্র—তোমাদের জন্ম তাদের মাথায় পা দিয়ে চলতে, আর তাদের জন্ম তোমাদের সেই পা-কে ভৃগুপদ বলে মাথায় বইতে। ইচ্ছে করেই যখন তোমাদের মায়া কাটিয়ে তাদের সঙ্গে এসে মিশেছি, তখন অপরাধ ত আমাদেরই বাবা।

ঋতেন। ভালো কথা!

প্রণব। আমি বলি কি সন্তোষ, তুমি এসিষ্টেণ্ট ম্যানেজার হও—অফিস করতে চাও করো, না করলেও ক্ষতি নেই।

সন্তোষ। অসংখ্য ধন্যবাদ! আপনি ত অনেক রকম করেই লোভ দেখালেন—আর নূতন চেষ্টায় লাভ কি? আপনাদের নরম-গরম দু'রকম পন্থাই আমরা চিনি প্রণব বাবু।

প্রণব। আহা, এখন ত আর ও-কথা ওঠে না। এখন যে তুমি আমার ভগিনীপতি, আমার কুটুম্ব—আমি যদি বুর্জোয়া হই, তুমিও ত কম বুর্জোয়া নও ভাই।

সন্তোষ। না, না, কখনো না। আমি আপনাদের ক্লাসে উঠে যাই নি, আপনার ভগিনীই নেমে এসেছেন আমাদের ক্লাসে—আমাদের আপনারা কুটুম্ব বলে ঠাট্টা করবেন না।

ঋতেন। না, না, যাও তোমরা।

সন্তোষ। হ্যাঁ, যেতে ত হবেই এবার—কালই রওনা হতে হবে আমাদের নাগপুরে।

ঋতেন। ধর্ম্মঘট বুঝি?

সন্তোষ। আজ্ঞে হ্যাঁ, ধর্ম্মঘটই। চলো নিনা।

[উভয়ের প্রস্থান]

প্রণব। জামাই—ওর সঙ্গে এ রকম করাটা কি ভালো হল? আমি ত জানতাম না, মোটে কাল শুনেছি। খুকীটা কি বোকা, বলতে হয় ত! ছি-ছি, বড়ই অভদ্রতা হয়ে গেছে!

ঋতেন। জামাই? একটা বিশ্বাসঘাতক, চোর, ছদ্মবেশে এসে আমার বংশের অপমান করে গেল—উপায় থাকলে ওকে আমি জেলে দিতাম।

প্রণব। উপায় কি? যা হবার হয়ে গেছে, এখন ত একটা মিটমাট করে ফেলতে হবে। সত্যি সত্যিই ত আর মেয়েটাকে জলে ফেলা যায় না!

ঋতেন। দেখো, আমি সেই স্যার ঋতেন হালদার—বাংলা দেশে যার নামে মাথা নোয়ায় না এমন এক ব্যাটা নেই! আমি জাত-এরিষ্টোক্রাট—আমার যে কথা, সেই কাজ। আমার ইচ্ছাব বিরুদ্ধে তুমি আমার কারবারে কম্যুনিজম চালাতে চেয়েছো, তার শাস্তি স্বরূপ আজই আমি ব্যবসা উইণ্ড-আপ করলাম। তোমার মা আমার সম্মতির অপেক্ষা না রেখে আমার শত্রু-পক্ষকে সাহায্য করেছেন, তাঁর সঙ্গে তাই আমি সমস্ত সম্পর্কচ্ছেদ করলাম। আর আমার মেয়ে আমার বুকে বসে একটা অন্ত্যজের সঙ্গে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে, তাই তাকে দূর করে দিলাম বাড়ী থেকে। এবার তোমরা দেখবে, বিদ্রোহ করতে আমিও জানি, আর সে বিদ্রোহ তোমাদের আধুনিকতার বিদ্রোহের চেয়ে একটুও কম মারাত্মক নয়!

প্রণব। জগৎ বদলেছে বাবা, সেই বদলকে প্রসন্ন মনে স্বীকার করেই নিতে হবে আমাদের। খানিকটা পথ না ছাড়লে আজ আর উপায় নেই!

ঋতেন। সে আমি পারবো না, এ জীবনে হার স্বীকার আমার দ্বারা হবে উঠবে না। না, না, কিছুতেই না।

মধ্যবিত্ত

[দো-তলা বাবান্দার সংলগ্ন ঘব—প্রমীলা দেবী এবং বিভূতোষ চৌধুরী সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে। প্রমীলাদেবীর বয়স চল্লিশের কোঠা পার হয়েছে—চেহারা শীর্ণ, কিন্তু সুন্দর। বিভূতোষ পঁয়তিরিশের মধ্যে—দোহারা সুশ্রী যুবক।]

প্রমীলা। কি করি বলুন? সংসারের অবস্থা ত সবি বলেছি আপনাকে।

বিভূতোষ। কিন্তু আমার কি কোন দোষ আছে তাতে? আমারও ত টাকার দরকাব।

প্রমীলা। সে ত ঠিকই। কিন্তু বিপদে পড়েছি বলেই ত দিতে পারছি না। নইলে এত দিন রয়েছি এ-বাড়ীতে, কোন দিন ত ভাড়া বাকী ফেলে রাখিনি। আর কিছু দিন সময় দিন—মিটিয়ে দোব সবই।

বিভূতোষ। অনেক সময় দিয়েছি আপনাদেব। তিন মাস ধরেই ত আপনারা আজ নয়, কাল, কাল নয়, পরশু—করছেন, আমি চুপ করেই আছি। কিন্তু কত দিন আব পারি? সত্যিই ত পরোপকার করাব জন্যে বাড়ী ভাড়া দিইনি আমি। আপনাদেবই একটা চক্ষুলজ্জা থাকা উচিত।

প্রমীলা। গরীবের কি আর লজ্জা থাকে বিভু বাবু? একে ত এই আকাল, তারওপর বোগ এসে ধবেছে, কি করে যে দিন যাচ্ছে আমাদের, সে শুধু গোবিন্দই জানেন!

বিভূতোষ। দেখুন, আপনাদের ঘরোয়া ইতিহাস আমি শুনতে চাইনি। ভাড়া দিতে না পারেন, বাড়ী ছেড়ে উঠে যান। তিন মাস আমার গুণাগার গেছে, গেছেই, আর আমি রাখতে পারবো না—সোজা কথা বলে দিচ্ছি আপনাকে।

প্রমীলা। কিন্তু কোথায় যাবো এক্ষুণি, ছেলেপুলে নিয়ে, রুগ্ন স্বামী নিয়ে? এত দিন আপনার বাড়ীতে আছি, এই দুঃসময়ে এমন করে তাড়িয়ে দেবেন আমাদের? আপনার ত ঈশ্বরের ইচ্ছায় অভাব নেই বিভু বাবু—দয়া করে কি আর কিছু দিন অপেক্ষা করতে পারেন না?

বিভুতোষ। অভাব নেই বলেই যে যা আছে সব পাঁচ-জনকে বিলিয়ে দিতে হবে, এমন কি লেখাপড়া আছে? আমি ত আর সি-আর-দাশ নই, সাধারণ মানুষ। আমারও ত খরচ আছে!

প্রমীলা। সে কি আর আমাদের এই কুড়ি টাকার জন্যে আটকে থাকছে? সত্যি বলছি আপনাকে, নানা রকমে বড়ই মুস্কিলে পড়েছি। তা না হলে এরকমটা হত না!

বিভুতোষ। দেখুন, ভেবেছিলাম বলবো না, কিন্তু না বলেও আর পারছি না!

প্রমীলা। বলুন না!

বিভুতোষ। এত যে কাঁদুনি গাইছেন, কিন্তু আপনার মেয়েদের সাজ-গোজের বহর দেখলে ত মনে হয় না যে আপনারা খুব কষ্টে আছেন। ভাববেন না যে আমি একেবারেই বেকুব—আমি সবই বুঝি!

প্রমীলা। কি বোঝেন?

বিভুতোষ। থাকগে, সে সব কথায় কাজ নেই আমার। পাকা কথা বলে দিচ্ছি আপনাকে—আমার বাড়ীতে থাকতে হলে, মাসের মাস ভাড়া দিতে হবে, না পারলে উঠে যেতে হবে। কোন অজুহাতই আর শুনবো না আমি। এই শনিবার পর্য্যন্ত ··

[মেজো মেয়ে রিণার প্রবেশ। তার বয়স পনেরো-ষোল—
সাজসজ্জা আধুনিক ধরণের।]

রিণা। মা শীগ্রী এসো, বাবার আবার সেই রকম হেঁচকি উঠছে!

প্রমীলা। ওষুধটা খাইয়েছিস?

রিণা। ওষুধ আর নেই—মোটে এক দাগ ছিল, সে ত সকালেই খাওয়ানো হয়ে গেছে।

প্রমীলা। বীণা কোথায়?

রিণা। দিদি বোধহয় ওষুধ আনতেই গিয়েছে। অনেক ত বেলা হল—এখনো আসছে না কেন? তুমি শীগ্রী যাও মা, বাবা হয়ত উঠে বসবেন আবার!

[প্রমীলার প্রস্থান]

বিভুতোষ। তোমার মাকে বলোগে, আমার দিক থেকে পাকা কথা তাকে

বলে দিইছি। তাঁর দিক থেকে পাকা কথা কি, সেটা আমি এখনি শুনে যেতে চাই।

বিণা। আপনার কি একটুও দয়া-মায়া নেই? দেখছেন, আমাদের কি রকম বিপদ—এর ওপর তাগাদা করছেন। আমরা ত আর বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছিনে।

বিভুতোষ। তা ত বটেই। যে পাবে, চাইলে দোষ হয় তারি—যাকে দিতে হবে, না দিলে তার আর কোনই কৈফিয়ৎ নেই।

বিণা। তা কেন? আমরা ত ইচ্ছে করে ফেলে রাখিনি—বড়দার টাকা এসে পৌঁছায়নি, তাইতেই বাকী পড়ে গেছে। টাকা এলেই দেখবেন, পাই-পয়সাটি অবধি হিসেব করে মিটিয়ে দোব। আমরা অমন ছোটলোক নই যে ভাড়া না দিয়ে পালাবো।

বিভুতোষ। কে ভদ্র, কে ছোট, আজও ঠিক চিনে উঠতে পারি নি। কিন্তু, হ্যাঁ, তোমার দাদার টাকা যদি আর না-ই আসে, তাহলে?

বিণা। ওমা, ওকি কথা! অমন কথা বলছেন কেন আপনি? সব টাকা বড়দা এক সঙ্গেই পাঠাবেন—তাঁর কি আর একটুও ভাবনা নেই?

বিভুতোষ। বেশ, থাকি ততদিন শূন্যে ধন্না দিয়ে।

রিণা। এতগুলো ফ্ল্যাট আপনার—সবাই ত ভাড়া দিচ্ছে, একটা ফ্ল্যাটের ভাড়া যদি না-ই পান কিছুদিন—এই দুর্ভিক্ষের দিনে।

বিভুতোষ। কিন্তু তোমাদের জন্যে যে অন্য ভাড়াটেরাও উঠে যাবার ভয় দেখাচ্ছে, তা জানো?

রিণা। কেন? আমাদের জন্যে উঠে যেতে চাইছে কেন?

বিভুতোষ। জানো না? যে ব্যাপার করছো তোমরা দু'বোনে, তাতেই।

রিণা। যারা এ সব কথা বলে, তারা ছোটলোক, ইতর।

বিভুতোষ। আমিও?

রিণা। আমি আপনাকে বলিনি—যারা বলে, তাদের বলেছি।

বিভুতোষ। কিন্তু যদি আমিও বলি? কি কথা কইছো না যে?

রিণা। কি বলবো? ইচ্ছে হয় বলুন।

বিভুতোষ। একবার দুপুরের দিকে যেয়ো ত, একটু কথা আছে।

রিণা। কি কথা?

বিভুতোষ। সে বলবো'খন।

রিণা। এখনি বলুন না।

বিভুতোষ। এই তোমার বাবার চিকিৎসার কিংবা তোমাদের বাকী ভাড়াটার কোন ব্যবস্থা করতে পারি কি না, সে সম্বন্ধে একটু আলাপ করবো। হ্যাঁ, এটা কিন্তু খুব প্রাইভেট—নইলে কে কি মনে করবে, তার ত ঠিক নেই! যাবে ত?

রিণা। ক'টার সময়?

বিভুতোষ। এই তিনটে নাগাত।

রিণা। আচ্ছা।

[বিভুতোষের প্রস্থান। চোরের মতো চুপি চুপি
হাবুলের প্রবেশ। আট বছরের ছেলে—
ওদের ছোট ভাই।]

হাবুল। দিদি কইরে মেজদি?

রিণা। ওষুধ আনতে গেছে। তুই ছিলি কোথায় এত বেলা পর্য্যন্ত? স্কুলে যেতে হয় না, হাট-বাজারে যেতে হয় না—বেশ ফুর্তিতেই আছিস।

হাবুল। না খেয়ে স্কুলে যাওয়া যায় কখনো? দু'দিন ত ভাত খাইনি!

রিণা। জামায় ও তোর লেগেছে কিরে? পার্কের খিচুড়ী খেয়ে এলি বুঝি? ছি-ছি, পেটের দায়ে শেষটা মান-অপমানও ভুলে গেলি!

হাবুল। না খেয়ে বুঝি থাকা যায়? সত্যেন বললে, চল দু'জনে চুপি চুপি খেয়ে আসি, তাইতেই গেলাম। তোদের জন্যেও নিয়ে এসেছি, অনেক দিয়েছে কিন্তু—কেউ কিছু জানতে পারেনি।

রিণা। ওরে আমরা যে ভদ্দর লোক—আমাদের যে না খেয়ে মরে গেলেও চেয়ে খেতে নেই! [কেঁদে ফেললো।]

[ভেতর দিককার বারান্দা। ডাঃ সুজিত সরকার ও বীণা দাঁড়িয়ে কথা কইছে। সুজিতের বয়স ত্রিশ—একহারা চেহারা, একটু ঢ্যাঙা। বীণা কুড়ি বছরের সুন্দরী তরুণী।]

ডাঃ সরকার। ভয় নেই! এ সব রোগ যতটা কষ্টদায়ক, ততটা মারাত্মক

নয়—যদি বুকে ব পেটে হঠাৎ কোন নূতন উপসর্গ না দেখা দেয়, তাহলে এখনো সারার যথেষ্ট আশা আছে। তবে শুশ্রূষা খুব ভালো রকম হওয়া দরকার—আর ওষুধ পথ্যও চাই।

বীণা। আপনার ওপর অনেক জুলুম করছি।

ডাঃ সরকার। না মিস ঘোষ, সে জন্যে কিছু নয়। আমার ছোট বোনের ক্লাসমেট আপনি, আপনার বাবাকে একবার করে দেখে যাচ্ছি এ এমন কিছু নয়। কিন্তু একটা কথা আমার বলতে বাধছে!

বীণা। কি বলুন।

ডাঃ সরকার। ওষুধপত্র ত আমাকেও কিনে আনতে হয়। আপনাদের এমনেই অনেকগুলো বিল বাকী পড়ে গেছে।

বীণা। বুঝি ডাঃ সরকার, কিন্তু নানা রকম বিপদ যাচ্ছে আমাদের। বাবার অসুখ—প্রথম মাসটা অফিস থেকে মাইনে দিয়েছিল, তারপর দু'মাস ছুটি দিয়েছিল বিনা মাইনেয়—কিন্তু কত আর ছুটি দেবে? ক'দিন হল তাঁর চাকরি গেছে। বাবা অবশ্য জানেন না সে কথা। তাই আফিসের জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠছেন এখনো।

ডাঃ সরকার। না, না, এ অবস্থায় ওঁকে কিছু না জানানোই ভালো। কিন্তু আপনার দাদা ত কি একটা কাজ করতেন না?

বীণা। দাদা মিলিটারীর চাকরি নিয়ে বাইরে গেছে। আজ পাঁচ মাস হল তার না আসছে চিঠিপত্র, না আসছে টাকা-পয়সা।

ডাঃ সরকার। তাইত মিস ঘোষ, ভাবনার কথা বৈকি।

বীণা। সেই জন্যেই ত আপনাকে এমন বিব্রত করছি ডাঃ সরকার! আমাদের আগে দেখতেন আশু বাবু, আশু ব্যানার্জ্জী—তিনি শেষ পর্য্যন্ত আর এলেন না। আসবেন কি? ফীজ ত দিতেই পারতাম না, এমন কি ওষুধও ক্রেডিটে আনতে হত।

ডাঃ সরকার। কিছু মনে করবেন না মিস ঘোষ, ব্যবসায়ী মাত্রেরই এই ক্যাসাদ। তা এক কাজ করুন না কেন—আমি হাঁসপাতালে ওঁর থাকার আর চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিই—আমি নিজে ত একজন ট্রাক-লেকচারার, একটু বলে দিলে সুব্যবস্থাই হবে।

বীণা। আমিও অনেকবার ভেবেছি সে-কথা। কিন্তু বাবা হয়ত তাতে

ভয় পাবেন—হয়ত তাহলে আর বাঁচানোই যাবে না তাঁকে। তাছাড়া মা-ও রাজী হবেন কি না সন্দেহ।

ডাঃ সরকার। হওয়া ত উচিত। নইলে এই চিকিৎসা বাড়ী থেকে চালিয়ে যাওয়া আপনাদের পক্ষে খুব সহজ হবে না। উপায় থাকতেও ভদ্র-লোক যদি না সারেন, সেটা বড়ই দুঃখের বিষয় হবে।

বীণা। আপনি কি অনুগ্রহ করে অন্য কোন রকম ব্যবস্থা করতে পারেন না ডাঃ সরকার?

ডাঃ সরকার। বলেছি ত মিস ঘোষ, দেখে যেতে আমার অসুবিধা নেই, আপত্তিও নেই, কিন্তু ওষুধ?

বীণা। ডাঃ সরকার, আপনার কাছে আমরা চিরকৃতজ্ঞ থাকবো, দয়া করে আপনি বাবাকে বাঁচান—আপনার টাকা শোধ আমি করবোই, একটু দেরী হবে হয়ত।

ডাঃ সরকার। আচ্ছা দেখি কি করতে পারি।

বীণা। তাহলে পাঠাবো ছোট বোনকে ওষুধ আনতে?

ডাঃ সরকার। আচ্ছা, শুধু এই সপ্তাহের জন্যে—কিছু মনে করবেন না, এর বেশী পেরে ওঠা আমার পক্ষে কঠিন। আচ্ছা আসি।

[প্রস্থান। রিণার প্রবেশ।]

রিণা। কি বললেন ডাক্তার বাবু?

বীণা। বললেন, ধারে আর ওষুধ দিতে পারবেন না।

রিণা। তাহলে উপায়?

বীণা। বললেন, হাঁসপাতালে ব্যবস্থা করে দিতে পারি।

রিণা। তুই কি বলিস? সে ত মন্দ নয়, ওষুধ-পথ্য ত পাবেন। এমন করে আর ক'দিন বাঁচিয়ে রাখবি?

বীণা। কিছুই ঠিক করতে পারছি না!

[পিয়ন একটা চিঠি ফেলে দিলে দরজার ফাঁক দিয়ে। বীণা সেটা কুড়িয়ে নিয়ে পড়তে লাগলো।]

রিণা। কার চিঠি রে দিদি? ও কি! ও কি! অমন করছিস কেন?

বীণা। রিণা রে, বড়দা নেই। মিলিটারী কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন যে জার্ম্মান বোমায়..

রিণা। বড়দা, অ্যাঁ, বড়দা!

বীণা। চুপ কর রিণা। কেউ যেন না শোনে—বাবা-মা কেউ না। তাহলে কিন্তু সর্ব্বনাশ হবে।

রিণা। দিদিরে! বড়দা!

[মাটিতে বসে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে তার হাতের মুঠো থেকে পাঁচখানা দশটাকার নোট মাটিতে খসে পড়লো।]

বীণা। এ কি, টাকা পেলি কোথায়?

রিণা। মমতার কাছে থেকে ধার করেছি।

বীণা। মমতা? পঞ্চাশ টাকা মমতা পেলো কোথায়?

রিণা। তোর কাছে মিছে কথা বলবো না রে দিদি, বাড়ীওয়ালা দিয়েছে।

বীণা। কেন?

রিণা। বিনা ভাড়ায় আরো তিন মাস থাকতে দেবে বললে, আর বাবার চিকিৎসার জন্যে এই টাকাগুলো দিলে।

বীণা। বাড়ীওয়ালা? বিভু বাবু? এই ক'দিন আগে যে সে এসে ভাড়ার জন্যে যাচ্ছেতাই অপমান করে গেল। সত্যি কথা কি বল ত?

[রিণা হঠাৎ বীণার গলা জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠলো।]

বীণা। কাঁদিস নে, কাঁদিস নে। কেন এমন ভুল করলি? ওটা একটা আস্ত বদমাস, মাতাল, বিয়ে করে নি, ব্রহ্মাণ্ডে ওর কেউ নেই—একলা বাড়ীতে থাকে, আর রাজ্যের মেয়ে ধরে ধরে আনে—সবই ত জানতিস!

রিণা। আর যে সহ্য হচ্ছিল না!

বীণা। ছিঃ, কাঁদিস নে, যা হবার হয়ে গেছে। আর কখনো যাসনে যেন ঐ শয়তানের কাছে।

[প্রমীলার প্রবেশ]

প্রমীলা। কোথায় গিয়েছিলি রিণি? আজ তিন-চার দিন থেকেই দেখছি, দুপুর বাজতে তর সয় না তোর। চটি পায়ে গলিয়েই খস খস করে বেরিয়ে যাস। খুব সখ করে বেড়ানোর সময় পড়েছে—না? অত বড় ধাড়ী মেয়ে, লজ্জা করে না একটু? বোনের গলা ধরে আবার ঢং করে কান্না হচ্ছে!

বীণা। চুপ করো মা, চুপ করো, ওর বড্ড শরীর খারাপ হয়েছে।

প্রমীলা। হক, মরুক না। লোকের ছেলে-মেয়ে মরছে, তোদের যমে নেয় না কেন?

বীণা। নিচ্ছে মা, নিচ্ছে, ব্যস্ত হয়ো না। ভিক্ষের পিচুড়ি খেয়ে আর ক'দিন প্রাণ থাকবে?

প্রমীলা। যেদিন ছিল, সেদিন সবই খাইয়েছি। আজ নেই, আজ ভিক্ষে করেই খাচ্ছিস। ভালো খেতে চাস ত যা না লোক ধরে পয়সা কামিয়ে আনগে যা! যাদের ভাত নেই, তাদের আবার কিসের মান, কিসের ইজ্জত? যা খুসী তাই করগে!

বীণা। তারো বাকী নেই মা, সবই হচ্ছে—তার আগে আর নিস্তার নেই আমাদের। এখন যাও তুমি, ছাতু-মাতু যা আছে, তাই দুটো খেয়ে নাও গে। রিণি, তুই চান করে বারান্দায় একটু শুয়ে ঘুমুগে যা। আমি হাবুলকে নিয়ে ওষুধটা নিয়ে আসি চট করে।

[প্রমীলার প্রস্থান]

রিণা। তুই যাসনে দিদি, আমার বুকের ভেতরটা বড্ড কেমন করছে।

বীণা। যা, যা, শীগ্গী চান করে ফেলগে। আমি এখুনি আসছি—নইলে ডাক্তার আবার বেরিয়ে যাবে।

[সিঁড়ির সামনের একটা ছোট কোণ। বীণা আর রঞ্জন কথা কইছে—
রঞ্জনের বয়স বছর সাতাশ। সৌখীন একহারা চেহারা।]

রঞ্জন। আমি জানতাম তুমি ডাকবেই, আমার এতখানি ভালোবাসা কখনো নিষ্ফল হবে না। যেদিন তুমি স্পষ্ট করে আমায় না বলে দিয়েছিলে, সেদিন সত্যি মনে হয়েছিল, আত্মহত্যা করবো। কিন্তু তার পরেই মনে হল—না, এ জীবনটা নষ্ট করবো না। তোমাকে আমি অর্জন করবো আমার সাধনা দিয়ে—তাতে আজ সফল হয়েছি, সত্যিই এ আমার সব চেয়ে বড় সৌভাগ্যের দিন!

বীণা। তোমাকে একটা বিশেষ কারণে ডেকেছি। কিছু মনে করো না।

রঞ্জন। কিছু না, কিছু না বীণু, আমি বুঝেছি তোমার উদ্দেশ্য। তুমি আমার ভালোবাসাটা খাঁটি কি না, যাচাই করে নেওয়ার জন্যে...

বীণা। ভালোবাসার কথা ভাববার মতো অবস্থায় এখন নেই আমি। তার চেয়ে ঢের ঢের তুচ্ছ, অথচ যা না হলে এক দণ্ড চলে না, এখন শুধু তাই হয়েছে আমার দিনরাত্রের ভাবনা।

রঞ্জন। কি ব্যাপার বীণু, বলো আমাকে। আমি থাকতে ভাবনা কি তোমার? তোমায় আমি কতটা ভালোবাসি তা ত জানোই।

বীণা। আমাকে তুমি বরাবরই ভালোবাসা জানিয়েছো—কিন্তু ও জিনিষটাকে আমি চিরদিন ভয় করেছি, তাই বরাবরই এড়িয়ে গেছি তোমায়। ভেবেছি, সত্যিই কি ভালোবাসো তুমি? সত্যিই কি আমাকে চাও?

রঞ্জন। বিশ্বাস হয়েছে ত এবার? বলো, বলো বীণু!

বীণা। তুমি আমায় গ্রহণ করো—আর আমি পারি না।

রঞ্জন। বেশ ত! কিন্তু বীণু, হঠাৎ এমন উতলা হয়ে উঠেছো কেন তুমি? হয়েছে কি?

বীণা। দাদা যুদ্ধে মারা গেছে, বাবার চাকরী নেই—তিন মাসের ওপর রোগে তিনি শয্যাগত, বাড়ীতে ভাত হচ্ছে না লঙ্গরখানার খিচুড়ি খেয়ে বেঁচে আছি আমরা- বাড়ী ভাড়ার দায়ে বাড়ীওয়ালা ছোট বোনের সর্ব্বনাশ করেছে। ছোট ভাইটা স্কুলে যেতে পারে না, মাইনে নেই, বই নেই—আমাদের বাঁচাও তুমি।

রঞ্জন। বলো কি? তোমার বদলে এত বড় একটা সংসারের বোঝা আমার কাঁধে তুলে দিতে চাইছো তুমি?

বীণা। তোমার ত পয়সা আছে, তাছাড়া তুমি ত আমাকে ভালোবাসো।

রঞ্জন। তা বাসি। কিন্তু তুমি? তুমি ত ভালোবাসার জন্যে আমাকে গ্রহণ করতে চাইছো না বীণু, চাইছো এই দুর্দ্দিনে সংসারের দায়িত্বটা আমার ওপর চাপাবার সুবিধা হবে বলে।

বীণা। হলই বা! ভালোবাসার খাতিরে কি আর তুমি এ ভারটা কিছুদিনের মতো নিতে পারবে না?

রঞ্জন। না বীণু, আমি তোমাকে চাই, তোমাকে নিতে পারি। কিন্তু

তোমার খাতিরে এই এক গাড়ী কুপোষ্যের ভার নিতে প্রস্তুত নই। তবে একটা হতে পারে ··

বীণা। কি ?

রঞ্জন। আমি তোমায় একটা মাসহারা দিতে পারি, অবশ্য বিয়ে করতে পারবো না তাহলে।

বীণা। তার মানে ?

রঞ্জন। মানে ত বোঝোই। তাছাড়া উপায়ও নেই আমার। জানো না বোধহয় যে তোমার কাছ থেকে সাড়া না পেয়ে শেষ পর্য্যন্ত আমি ইরাকে...

বীণা। যাও, যাও তুমি, এখুনি চলে যাও।

রঞ্জন। বেশ, বেশ, তাই যাচ্ছি। ইস, ভারী চালাক! ভেবেছিলে, ভালোমানুষী করে আমার ঘাড় ভেঙে টাকা আদায় করবে—না? খাসা ব্যবসাদার হয়ে উঠেছো ত এরি মধ্যে! [প্রস্থান]

[সিঁড়ির মুখ দিয়ে তে-তলার ফ্ল্যাটে যাচ্ছিলেন মিঃ বোনারজী—
একজন বড় ফিল্ম-মালিক। একচোখে চশমা, পরণে
বিলেতী স্যুট, হঠাৎ দাঁড়ালেন।]

মিঃ বোনারজী। এই যে মিস ঘোস, আপনার বাবা কেমন আছেন?

বীণা। একটু ভালো। নূতন একটা ইনজেকসন করানো হচ্ছে ক'দিন থেকে, তাতেই খানিকটা উন্নতি হয়েছে।

মিঃ বোনারজী। বেশ, বেশ। আপনার দাদার খবরে ভারী দুঃখিত হয়েছি। কি করবেন বলুন? অদৃষ্ট! হ্যা, আজকাল জুনিয়ার মিস ঘোষকে দেখি না কেন? এখানে নেই নাকি তিনি?

বীণা। ক'দিন থেকে তার শরীরটা ভালো যাচ্ছে না, তাই বেরোয় না।

মিঃ বোনারজী। ওঃ! আচ্ছা চলি। আপনার বাবাকে শুভেচ্ছা জানাবেন আমার।

বীণা। মিঃ বোনারজী!

মিঃ বোনারজী। কিছু বলছেন আমাকে?

বীণা। হ্যা, বলছিলাম যে ··

মিঃ বোনারজী—বলুন, বলুন।

বীণা। একটা কোন রকম চাকরী দিতে পাবেন আমাকে? যে-কোন রকম চাকরী, শ'খানেক টাকা মাইনের।

মিঃ বোনারজী। চাকরী? চেষ্টা করে দেখতে পারি। কিন্তু অত টাকা কি কেউ দিতে চাইবে?

বীণা। দয়া করে একটা দিন মিঃ বোনারজী। চিরদিন আপনার কাছে কেনা হয়ে থাকবো আমরা আমাদের দিন আর চলছে না।

মিঃ বোনারজী। আমার নিজের জন্যে অবশ্য একজন লেডী-সেক্রেটারী দরকার—আর ও টাকা কেন, ওর চেয়ে কিছু বেশী দিতেও আমি প্রস্তুত। কিন্তু

বীণা। কিন্তু কি বলুন।

মিঃ বোনারজী। আপনি ত জানেন, আমি ব্যাচিলার, আর আমার চাল-চলনও কি বলে গিয়ে তেমন ধারা

বীণা। কিছুতেই আমি গররাজী নই, মিঃ বোনারজী। আমার বাবাকে যদি সারিয়ে তুলতে পারি, ভাই-বোনকে যদি খেতে-পরতে দিতে পারি, লেখাপড়া শেখাতে পারি, মা'র মনে যদি শান্তি ফিরিয়ে আনতে পারি, তাহলে আমার নিজের ভাগ্যে যাই হক—আমি আর ভাববো না

মিঃ বোনারজী। কিছু মনে করবেন না মিস ঘোষ। শুধু হাতে কারুর দান নেওয়ার অপমান আমি আপনাকে স্বীকার করতে বলি না। আমিও বুঝতেই ত পারছেন, cheerless, companionless—শুধু কাজ নিয়েই ডুবে আছি। তাই বলছিলাম, Let us be friends and remain as such. আপনি আজ থেকেই আসতে পারেন।

বীণা। আচ্ছা মিঃ বোনারজী, অসংখ্য ধন্যবাদ। কিন্তু একটা কথা—আমার হাত একদম খালি।

মিঃ বোনারজী। সে জন্যে কি? আমি এখুনি আপনাকে শ'পাচেক টাকা পাঠিয়ে দিচ্ছি। ওটা advance payment মতো করা রইলো, আপনার মাইনে আপনি ঠিক মাসের আগেই পাবেন। আচ্ছা চলি এখন।

[প্রস্থান]

[পেছন থেকে বোঁ করে রঞ্জনের প্রবেশ]

রঞ্জন। একটা কথা বলতে এলাম।

বীণা। কি ?

রঞ্জন। সিঁড়িতেই ছিলাম। তোমার শিকার ধরার কৌশলটা দেখলাম ভালো করেই। লজ্জা করে না ? এক দিন তুমি না পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েটে পড়ছিলে ? ভদ্রলোকের মেয়ে বলে পরিচিত ছিলে ? ছি-ছি, তুমি বাজারে মেয়েদেরও অধম ! টাকার জন্যে আজ তুমি নিজে থেকে আপন দেহ বিক্রী করার কথা বলতে পারলে ! ইস, এই তুমি আমায় বলেছিলে বিয়ে করতে ? ভাগ্যিস আমি তোমার ভরসায় বসে থাকিনি !

বীণা। তুমি যদি মানুষ হতে, তাহলে বুঝতে, পঞ্চাশ সালের দুর্ভিক্ষে বাংলা দেশের কি হয়েছে ! কিন্তু কোন দিন যা জানতে পারোনি, পারতেও না কোনদিন, সেই কথাটা শুনে যাও আজ—তোমাকে আমি সত্যিই ভালোবেসেছিলাম, সত্যিই চেয়েছিলাম একদিন।

রঞ্জন। সত্যি ? তাহলে ফিরে এসো, ফিরে এসো, বীণু। তোমাকে আমি বিয়ে করবো—সব দায়িত্ব আমি নোব।

বীণা। যাও, যাও তুমি এখান থেকে। একটু আগেই আমি বিক্রী করে দিয়েছি নিজেকে—আব উপায় নেই।

[বেয়ারার প্রবেশ]

বেয়ারা। দিদিমণি, সাহেব এই খামটা পাঠিয়ে দিয়েছেন।

দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা

[হরিণভাসা গ্রামের কুটীর—তারণ গোয়ালা ও তার স্ত্রী ভবী।]

তারণ। আজ আর একটি পয়সা হল না। ক'দিন হচ্ছিল কিছু কিছু—কাল থেকে গাঁয়ের মাগীরা গিয়ে ভীড় করেছে এষ্টেশানে। বাবু-ভায়া তাদের ছেড়ে আর আমাদের হাতে মোট দেবে কেন ?

ভবী। কি ঘেন্না ! গেরস্ত ঘরের বৌ-ঝি যাচ্ছে এষ্টেশানে মোট বইতে ?

তারণ। না গিয়ে কি করবে ? পুরুষমানুষ যে কাজে পায় দু'আনা

মেয়েমানুষ তাতেই ছ'আনা আদায় করতে পারে। সবাই তাই মাগীদের ঠেকিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছে রোজগার করে আনতে।

ভবী। এতে কি ইজ্জত থাকবে মেয়েমানুষের?

তারণ। আর মান-ইজ্জত! টাকায় সওয়া-সের চাল, পাঁচ টাকায় একখানা কাপড়—আজকের দিনে জানই বড়, মানের কথা ভাববে কোন শালা?

ভবী। কি যে করবে ভগমান শেষ পর্য্যন্ত! ঘরে সেয়ান মেয়ে—এদিক-সেদিক যাচ্ছে ওল-কচু তুলতে, কার পাল্লায় পড়ে কি করে বসবে কে জানে!

তারণ। করুক, ও নিয়ে আর মাথা ঘামাইনে। সোমত্ত মেয়ে, বিয়ে দিতে পারি নি, পেটে দু'মুঠো ভাত, পরণে একখানা কাপড় দিতে পারি নে, সতীলক্ষ্মী হয়ে সে যদি না থাকে ত যা করে জান বাঁচাতে পারে, তাই করুক।

ভবী। বাপ হয়ে কি করে বলছো?

তারণ। বলছি কি আর সাধে? ঘরে এক বিশ ধান নেই, কোন ব্যাটা চার গণ্ডা পয়সা মজুরী দিয়ে মুনিস খাটাতে চায় না, ক্ষেত-খামারের কাজ উঠে গেছে, নৌকোর পাট বন্ধ—কি দিয়ে প্রাণ রক্ষে হবে? প্রাণই যদি গেল ত কিসের ইজ্জত, কিসের চরিত্তির? পারলে চুরি করতাম!

ভবী। আচ্ছা ক্যাদার ঠাকুরপো যে বলছিল সেদিন কলে যাবার কথা।

তারণ। বলছিল ত! কিন্তু জানিস কল কি? নরক, নরক! আর সেখানেই কি ভাত আছে?

ভবী। কেন মজুরী ত দেয় তারা।

তারণ। তা দেয়—এক হাতে দেয়, আর এক হাতে টেনে নেয়। নইলে কথায় কথায় এমন ধর্ম্মঘট হয় কেন? দল বেঁধে সবাই ভিক্ষে করতে আসে দেখেছিস ত মাঝে মাঝে। এই ত সেদিনও এসেছিল!

ভবী। ক্যাদার ঠাকুরপো যে বলে···

তারণ। বলুক গে। ওর কি? ঘর-সংসার নেই, মাগ-ছেলে নেই, কলেই যাক আর জেলেই যাক, ওর ত যায় আসে না। আমার যে সর্ব্বাঙ্গে পেট—তার ওপর ঘরে একপাল য়্যাসী, আমার কি সে উপায় আছে?

ভবী। ছেলে-মেয়েগুলোকে আর কত না খাইয়ে রাখবো? দেখো না যদি···

তারণ। থাম, থাম, নয়ত যা তুই ক্যাদারের সঙ্গে। ও ত আসেই তোকে

পটাবার মৎলবে—ইচ্ছে হয় ত যা তার সঙ্গে বেরিয়ে। ভাত দিতে পারি নে, আমি আবার কি দরের ভাতার ?

ভবী। মাগো, এমন কথাও বলতে পারছো তুমি ?

তারণ। বলবো না ? সমস্ত দিনে আজ দুটো গণ্ডা পয়সা রোজগার হয়নি—আমার কি আর মাথার ঠিক আছে ? আঃ বসি একটু। কৈ পুঁটী, এক ঘটি জল দে ত বাপ।

ভবী। পুঁটু ত সেই সকালে গেছে ঝুমনী আর লক্ষ্মীর সঙ্গে শাগ তুলতে।

তারণ। বেশ, বেশ, সমস্ত দিন আর সমস্ত রাত্তির ধরে শাগ তুলুক হাবামজাদী। ছোট দুটো গেল কোথায় ?

ভবী। গোঁসাইরা ফ্যান দিচ্ছে, তাই আনতে পাঠিয়েছি।

তারণ। গোরুকে লোকে ফ্যান খাওয়াতো—সেই ফ্যান আজ মানুষে খাচ্ছে, তা-ও মেলে না ! হা রে দুনিয়া—এর পরও মানুষ বেঁচে থাকে, এত, শক্ত জান মানুষের !

[গোপলা আর বুঁচীর প্রবেশ]

গোপলা। দিলে না, ফর্সা মতো একটা ছোঁড়া ছোড়দিকে কি সব বললে, তারপরই ঠাস ঠাস করে গালে চড় মেরে তাড়িয়ে দিলে দু'জনাকে।

তারণ। কি বললে রে বুঁচী ?

বুঁচী। বললে, তোর দিদিকে আসতে বলিস, খুব বেশী করে দোব। আরো সব অনেক কথা।

তারণ। হুঁ, তুই বুঝি তাতে কিছু বললি ?

গোপলা। হ্যাঁ বাবা, ও বললে, দিদি তোর মুখে লাথি মারবে।

তারণ। তারপরই চড় মারলে ? গোঁসাইদের ফটকে বুঝি ? শালা শুওয়ের বাচ্চা কোথাকার !

গোপলা। সকাল থেকে কিচ্ছুটি খাইনি বাবা—পেটের ভেতর চিন চিন করছে বড্ড। পদ্ম বিলে জল খাচ্ছিলাম, ছোড়দি বললে জল খাসনে, ভিরমি লাগবে।

ভবী। কিছু এনেছো এষ্টেশান থেকে ?

তারণ। এনেছি আমার মাথা আর মুণ্ডু। এই নাও।

গোপলা। ওরে দিদি, আম রে, বোম্বাই আম ! আমি দুটো খাবো ! ঐটা দাও, ঐটা দাও মা আমাকে।

বুঁচী। কি আম বাবা?

তারণ। বোম্বাই আম, খা তুইও একটা।

[দু'জনে আম খেতে খেতে দৌড়ে বেরিয়ে গেল রাস্তার দিকে।]

ভবী। আম কোথায় পেলে? এত ভালো আম, এতগুলো?

তারণ। চুরি, চুরি, পেটের দায়ে চুরি করেছি। পেলাট-ফরমে দুটো টুকরী ছিল—চালান এসেছে—একটা ছোঁড়া আমাকে দেখালে। দু'জনে তলা ফাঁসিয়ে তা থেকে একটা-দুটো করে গোটা বিশেক আম চুরি করলাম, তারপর গামছা মুড়ি দিয়ে নিয়ে সোজা পালালাম রাণীর ঘাটের দিকে।

ভবী। চুরি করলে?

তারণ। আজ চুরি করেছি, কাল ডাকাতি করবো—তারপর খুন করে হয়ত ফাঁসে যাবো।

[বাইরে থেকে কে ডাকলো]

ভবী। ঐ শোনো, গোয়াল বটঠাকুর ডাকছে। [প্রস্থান]

তারণ। এসো দাদা, ভেতরে এসো।

[মুকুন্দর প্রবেশ]

মুকুন্দ। রাজীর মা ত গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে—এখন উপায় কি বল? কালীমণ্ডলের ভাঙা ঘরে লাস ঝুলছে, কেউ অবশ্যি দেখেনি এখনো!

তারণ। একটু ঘোর হক, দু'জনে ছালায় ভরে নিয়ে গিয়ে জলে ফেলে আসবো। আর কি করবে দাদা? এই হবে এখন ঘরে-ঘরে।

মুকুন্দ। মলো, না বাঁচলো! পাঁচ দিন না খেয়ে খেয়ে শেষটা মেয়েটা গেল এষ্টেশানের এক খোট্টা চামারের সঙ্গে বেরিয়ে—এক ব্যাটা মাল্লা করলে মাগীকে ধরে খেয়াখাটে বে-ইজ্জত—সেই অন্ন মুখে রোচে কখনো?

তারণ। রাজী এখন কোথায়?

মুকুন্দ। ভগমান জানেন!

তারণ। আমার মেয়েটাকেও ত সকাল থেকে দেখছিনে। কে জানে দাদা, সে-ও সরে পড়লো কি না কারুর সঙ্গে। কিছু খেয়েছো?

মুকুন্দ। কাল থেকে ও-পাট হয় নি।

তারণ। ও বৌ, দে না দাদাকে একটু আম খেতে।

মুকুন্দ। ক্ষেপেছিস তুই তারণ! মাগ ঝুলছে গলায় দড়ি দিয়ে, মেয়ে

করছে ছুটাবিত্তি, আর আমি বসে বসে আম খাবো ? আমি এখন যাই, একটা ছেঁড়া ছালা যোগাড় করে রাখিগে—সন্ধ্যে হলেই কিন্তু যাস ভাই। হ্যাঁ, আম বুঝি কুড়িয়ে এনেছিস এষ্টেশান থেকে ? পচা আম, তাই নিয়েই কি কাড়াকাড়ি মাগী-মদ্দতে !

[মুকুন্দের প্রস্থান। ভবীর প্রবেশ।]

ভবী। মাগী মলো তাহলে !

তারণ। মরবে বৈ কি, সবাই মরবে—তুইও মরবি, আমিও মরবো—কোন ভাবনা নেই তোর। তা ছুঁড়ীটা গেল কোথায় ?

ভবী। কি করে জানবো ? ভয়ে ত বুক গুর গুর করছে আমার ! কে জানে যদি রাজীর মতোই ··

[পুঁটীর প্রবেশ]

তারণ। কোথায় গিয়েছিলি ? পেটের দায়ে শেষটা জাত-ইজ্জত ভুলে গেলি নাকি সব ? সোমত্ত মেয়ে !

ভবী। আহা, কিছু বলো না ওকে। দেখছো না ওর মুখ-চোখ কি হয়েছে ! অমন রূপ, না খেয়ে খেয়ে বাছার আমার রং পুড়ে কালি হয়ে গেছে ! শাগ-পাত কিছু পেলি পুঁটী ?

পুঁটী। কিচ্ছু পাইনি মা।

ভবী। তবে এতক্ষণ কোথায় ছিলি ? ও কি, কাঁদছিস কেন রে ? কি হল, অ্যাঁ কি হল তোর ? কেন অমন করে বকো তুমি ? দুঃখীর ঘরে জন্মেছে, তাইতেই এত হেলাফেলা—নইলে রাজবাড়ীতেও এমন মেয়ে হয় না গো। চ তুই মুখে জল দিবি। তোর বাপ ভালো আম এনেছে, একটা খাবি চ।

পুঁটী। কিছু খাবো না মা, আমার শরীর কেমন করছে—একটু শোব। একটা কাঁথা পেতে দাও।

[দু'জনের প্রস্থান]

তারণ। আমি একটা ডুব দিয়ে আসি।

[প্রস্থান। কেদারের প্রবেশ।]

কেদার। ও বৌ, কোথায় গো ?

ভবী। আসছি ঠাকুরপো। পুঁটীর কম্প দিয়ে জ্বর এসেছে, তাকে ভালো করে শুইয়ে দিয়ে আসি।

কেদার। এই নাও বৌ, সের-দুই চাল—অনেক কষ্টে জোগাড় করেছি লাইনে দাঁড়িয়ে। সে কি পাওয়া যায়? মেয়ে-মদ্দর কি গুঁতোগুঁতি! এক জায়গায় নিয়ে আবার লুকিয়ে গেলাম আর এক লাইনে। কাপড়ও এনে দোব একখানা কালকে!

ভবী। না ঠাকুরপো, ও-সবে আর দরকার নেই, তুমি এক্ষুণি চলে যাও। ছেলে-মেয়েগুলোর দুঃখ দেখতে না পেরেই আমি রাজী হয়েছিলাম, ও আমি আর পারবো না। যা করেছি তা করেছি, আর তুমি এসো না এ-বাড়ীতে। আমাদের কপালে যা আছে, তাই হবে।

কেদার। হঠাৎ কি হল তোমার? নাও, নাও, পাগলামি করো না।

ভবী। না, না, তোমাকে ত বলেছি ঠাকুরপো—ও-সব আর হবে না।

কেদার। বটে? তবে আমার সঙ্গে ধাপ্পাবাজী করে এতদিন মিথ্যে ঘোরালে কেন?

ভবী। ধাপ্পাবাজী কি করেছি ঠাকুরপো? যার চেয়ে বড় পাপ নেই, তাই ত করেছি পেটের দায়ে। কিন্তু আর না, এ প্রাণ আর রক্ষে হবে না, শুধু শুধু খালি পাপের ভার বাড়িয়ে কি করবো? তুমি যাও—আর কোনদিন এসো না।

কেদার। ঠিক ত? না, আবার কালই চাল বলে কান্না সুরু করবে?

ভবী। না, আমি যদি মানুষের মেয়ে হই ত আর কোনদিন বলবো না।

কেদার। বেশ। দেখি তোমার ধর্ম্মজ্ঞান ক'দিন টেঁকে!

[প্রস্থান। তারণের প্রবেশ।]

তারণ। যা ভেবেছিলাম, তাই। পাড়ার লোক ভেঙে পড়েছে কালী মণ্ডলের ভিটেয়! ও কখনো চাপা থাকে? ইস, কি ভয়ানক চেহারা হয়েছে মাগীর—গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে যেন রাক্ষসীটা!

ভবী। কোন দিন দেখবে আমারও ঐ দশা হয়েছে।

তারণ। আশ্চর্য্যি কি? যে রকম নিত্যি নিত্যি ক্যাদারের আনাগোনা আরম্ভ হয়েছে!

[পরের দিন বিকেল। ঐ বাড়ীর উঠান—ক্ষেত্রমাঝি ও তারণ।]

ক্ষেত্র। ডাকাতি বলো, বলতে পারো। কিন্তু অই মহাজনরা যখন

ফাঁকি দিয়ে গাঁয়ের লোকের মুখের অন্ন কেড়ে নিলে, তখন সেটা ডাকাতি হয়নি?

তারণ। কেড়ে আর নিলে কৈ খুড়ো? দাম দিয়েই ত কিনেছে!

ক্ষেত্র। আরে বাবা, কৌশলী ডাকাত যারা হয়, তারা তাই করে। পাঁচ টাকার ধান দশ টাকা দিয়ে কিনতে লাগলো—তোরা ভাবলি, না জানি কি সুখের দিনই এলো! নগদ টাকা হাতে পেয়ে কেউ কিনলি সাইকেল, কেউ করলি আর একটা বিয়ে—এখন দেখ, সেই ধানের চালই কিনতে হচ্ছে চল্লিশ টাকা দিয়ে, আর সে ওদেরই কাছ থেকে।

তারণ। এমন যে হবে তা কে জানতো খুড়ো? নৌকো গেল, হাল-বলদ গেল, ক্ষেত-খামারের কাজ গেল, লোকে জন-খাটতেও ডাকে না—একেবারে আকাল। তাইতেই ত ওরা জো পেয়ে গেল খুড়ো!

ক্ষেত্র। তা ত পাবেই বাবা। সুবিধে পেলে আর কে কবে পরের ঘাড়টা না ভাঙে? কিন্তু মানুষের বাচ্চা হয়ে ঘাড় এগিয়ে দেওয়া ত ঠিক নয়—শিং নেড়ে ত দেখতে হয় একবার।

তারণ। তাইত খুড়ো!

ক্ষেত্র। তাই ত বললে আর হবে না বাপু। মাগীগুলো পেটের দায়ে কেউ হচ্ছে কুটী, কেউ করছে ভিক্ষে, কেউ দিচ্ছে গলায় দড়ি—মদ্দগুলো করছে চুরি-চামারি—যারা কিছু পারছে না, তারা ঘরে মরে পড়ে থাকছে। আমি বলি কি, আঁটকুড়ীর ব্যাটারা যদি মরবিই, ত মানুষের মতো মর না!

তারণ। তা যা বলেছো সত্যি।

ক্ষেত্র। গোঁসাই সম্বন্ধীরা গাঁয়ের সমস্ত ধান টেনে নিয়েছে, কারুর ঘরে একটি কাণা খুদ নেই যে খাবে, আবার পয়সাও নেই যে বাজার-দরে কিনে আনবে। এখন কি করতে চাস তোরা?

তারণ। বলো তুমি।

ক্ষেত্র। শোন, সহর থেকে লোক আসছে সব মহাজনের আড়ৎ দেখতে—মজুত ধান-চাল পেলেই আটক করবে। তাই গোঁসাই শালারা রাতারাতি সমস্ত মাল এদিকে-ওদিকে সরিয়ে ফেলছে—জগা কৈবত্ত, রতা, মঙ্গলা রাত করে নৌকো বোঝাই দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে রোজ। কারুকে কিছু বলে না, টাকা দিয়ে মুখ বন্ধ করে রেখেছে।

তারণ। হুঁ, নেমকহারাম শালারা।

ক্ষেত্র। আমি সব টের পেয়েছি বাবা। কালও চার-পাঁচ নৌকো মাল বোঝাই হয়েছে—কোয়াড়ী খালের সেই জঙ্গলে বেঁকটার মধ্যে লুকানো আছে, আজ রাত্তির হলেই চলে যাবে। আজ জোনাক উঠবে অনেক দেরীতে, এই ফাঁকে দল বল নিয়ে পড়ে যদি নৌকো লুঠ করতে পারিস…

তারণ। সর্ব্বনাশ! ওরা কি আর লোকজন রাখেনি খুড়ো?

ক্ষেত্র। রাখলেই বা! আমরাও ত লোক, মায়ের দুধ খাইনি আমরা? ত্রিশজন গিয়ে পড়বো—মাথাগুলো বেলের মতো গুঁড়িয়ে দোব শুয়োর ব্যাটাদের, তারপর সিধে নৌকো বেয়ে চলে আসবো কোটালীর ঘাটে।

তারণ। পায়ের আওয়াজ শুনছি খুড়ো! চুপ করো।

[ছিষ্টিধরের প্রবেশ]

ক্ষেত্র। কে, ছিষ্টে? আয় বাপ। সব ঠিক-ঠাক ত?

ছিষ্টিধর। হ্যাঁ জ্যাঠা। আমার দল ঘিরবে গোঁসাই বাড়ী, আর ভোলার দল ঘিরবে কোয়াড়ীর বন—তোমরা যাবে নৌকোয়।

ক্ষেত্র। লাঠি-সোটা…

ছিষ্টিধর। সব ঠিক আছে—শুধু কুপি চাই গোটা কতক।

তারণ। আমার কিন্তু ভয় করছে খুড়ো।

ক্ষেত্র। কিসের ভয়? মরণের? মরতে আর বাকী আছে কি বাবা? না খেয়ে আর ছাই-ভস্ম খেয়ে কত গণ্ডা ত মরলো, না হয় মার খেয়েই মরবে আর কতকগুলো। তৈরি হয়ে নাও তারণ—আর কোন ভাবনা-চিন্তা করো না, এক ঘড়ীর মধ্যেই গিয়ে পৌঁছুতে হবে কিন্তু। [প্রস্থান]

তারণ। ভালো হচ্ছে কি ছিষ্টিধর?

ছিষ্টিধর। ভালো ত নয়ই, কিন্তু মন্দতে আর ভয় কি আমাদের? বেশী মন্দ আর কি হবে?

তারণ। তা বটে! আচ্ছা, আমি একটু আসছি।

[প্রস্থান। পুঁটীর প্রবেশ।]

ছিষ্টিধর। বৌ কোথায় রে? দেখছি না যে!

পুঁটী। জানোই ত—ভিক্ষেয় বেরিয়েছে বুচী আর গোপলাকে নিয়ে।

ছিষ্টিধর। হেঁ। কৈ, বললি নে পুঁটী ফটকে গোঁসাই কি করেছে?

পুঁটী। আর এক দিন বলবো।

ছিষ্টিধর। আজকের রাত পেরুলে তবে ত আর এক দিন! আজই আমার শেষ রাত্তির।

পুঁটী। সে কি?

ছিষ্টিধর। আগে বল, তারপর বলছি।

পুঁটী। কি আর বলবো? চাল চাইতে গিয়েছিলাম—বললে, ঘরে আয় দিচ্ছি, এই বলে নিয়ে গিয়ে··

ছিষ্টিধর। বে-ইজ্জত করলে?

পুঁটী। হুঁ।

ছিষ্টিধর। চাল দিলে তারপর?

পুঁটী। দিয়েছিল সের পাঁচেক।

ছিষ্টিধর। কেন গিয়েছিলি আনতে? এই ফটকে শালা কতবার না তোকে ফুঁসলেছে!

পুঁটী। সাধে গিয়েছিলাম? না খেয়ে খেয়ে ভাই-বোন দুটো মারা পড়ার মতো হয়েছিল—ক্যাদার কাকা লুকিয়ে এক সের সওয়া-সের চাল দিয়ে যেতো, তাই ফুটিয়ে মা ওদের দিতো। ক্যাদার কাকাকে ত জানো, মায়ের ওপর তার চিরদিন লোভ, তাইতেই ভাবলাম ফটিক গোঁসাইয়ের কথায় যদি রাজী হই, তাহলে ··

ছিষ্টিধর। পুঁটী, আমি রঘুমাঝির ব্যাটা, আমার জ্যাঠা ক্ষেত্তর মাঝি—পেটে ভাত নেই, তবু লাঠি ধরতে ভুলিনি। ঠ্যাঙাড়ের ঝাড় আমরা! তোর ইজ্জতের দাম তুলে আনবো আমি—নইলে আমি বাপের ব্যাটাই নই।

পুঁটী। কি করবে?

ছিষ্টিধর। এই দেখ গাঁড়াসা—ফটকের মাথা আমি এই দিয়ে আস্ত কেটে আনবো। তোর বাবা কোথায় গেল রে?

পুঁটী। কি জানি! বড্ড ভয় করছে আমার!

[ভবী ও ছেলে-মেয়ের প্রবেশ। ছিষ্টিধরের প্রস্থান।]

ভবী। তোর বাপ কোথায়? একলা বাড়ীতে সোমত্ত ছোঁড়ার সঙ্গে কি এত কথা তোর লো?

পুঁটী। ক্ষেত্তর জ্যাঠার সঙ্গে এসেছিল কি কাজে! বাবাকে নিয়ে জ্যাঠা কোথায় গেল, ছিষ্টিকাকা জল খেতে চেয়েছিল।

ভবী। ঢং করিসনে পুঁটী। আমি কিছু বুঝিনি, না? পেটের দায়ে জাত-কুল আর রাখলি নি।

পুঁটী। গোপলা, ওটা কি রে? কি খাচ্ছিস?

বুঁচী। কাঁঠালের ভূঁতি রে দিদি, পথ থেকে কুড়িয়ে নিয়েছে—এত করে বলছি ফেলে দিতে!

ভবী। কাঠখড়ি কিছু জোগাড় করেছিস? চড়িয়ে দে চাল ক'টা—বাছারা টা-টা করছে ক্ষিদেয়। আমি ততক্ষণ নেয়ে আসি। আর কি বেলা আছে? [প্রস্থান]

পুঁটী। চল গোপলা আমি ভাত চড়াচ্ছি। আয় বুঁচী, উনুন ধরাবি।

[সকলের প্রস্থান।

ভাঙা দরজা দিয়ে একদল লোকের প্রবেশ।]

প্রথম। ঐ দেখ, উনুন জ্বলছে!

দ্বিতীয়। আছে, ওদের খাবার আছে।

তৃতীয়। চেঁচা। এই কে আছো? শীগ্রী এখানে এসো।

[পুঁটীর প্রবেশ]

পুঁটী। ও মাগো, গেলাম গো!

প্রথম। চুপ, চেঁচালে খুন করবো। কি রাঁধছিস, দে শীগ্রী।

দ্বিতীয়। আমরা না খেয়ে মরবো, আর তোমরা মজা করে সকাল-বিকেল ভাত খাবে?

তৃতীয়। ধর বেটীকে, দেখতে খাসা—সহরে নিয়ে গিয়ে বেচে দোব।

পুঁটী। ওঁ-ওঁ-ওঁ।

[গোঁ গোঁ করে মাটীতে পড়ে গেল। একদিক থেকে ছেলে মেয়ের, অন্য দিক থেকে ভবী ও তার পেছন পেছন তারণের প্রবেশ।]

তারণ। কে, কে তোমরা?

প্রথম। আমরা? আমরা নরঘাটের লোক।

তারণ। কি চাও তোমরা?

দ্বিতীয়। ভাত, তোমরা দু'বেলা খাচ্ছো।

তৃতীয়। আর আমরা না খেয়ে মরে যাচ্ছি।

চতুর্থ। দাও শীগ্রী।

তারণ। ভাইরে, ভাত কোথায়? দুধের ছেলে-মেয়ে ধুঁকছে খিদের জ্বালায়। বাড়ীতে তিনদিন উপুস।

প্রথম। ঐ যে উনুন জ্বলছে!

ভবী। উনুন? চলো দেখবে। [সকলের প্রস্থান।
একটু পরে আবার প্রবেশ।]

প্রথম। ঐ ক'টি চাল মোটে?

ভবী। হ্যাঁ বাবা, ঐ ক'টি—তিন গাঁ ঘুরে জোগাড় করেছি। ছেলে-মেয়ে দুটোকে দু'মুঠো ফুটিয়ে দোব—আমাদের জন্যে আর কিছু নেই।

দ্বিতীয়। পয়সা নেবে? চারটে পয়সা আছে—এই নাও, কিছু কিনে খাওগে তোমরা।

তৃতীয়। বড় দুঃখ মা, বড় দুঃখ! পথে পথে ঘুরছি পেটের জন্যে।

তারণ। তোমরাও দেখছি আমাদেরই মতো হতভাগা!

প্রথম। না ভাই, তোমাদের ছেলে-মেয়ে আছে, এখনো ঘরে বসে আছো—আমাদের সব গেছে, সব শেষ হয়ে গেছে।

চতুর্থ। চলে যাচ্ছি ভাই, চলে যাচ্ছি আমরা। খিদেয় জ্ঞান-গম্যি নেই—জানোয়ার হয়ে গেছি একেবারে! [চার জনের প্রস্থান]

তারণ। গেল রে, দুনিয়া ডুবে গেল!

ভবী। যাক, এখনি যাক।

[পরের দিন বিকালে ঐ বাড়ীর উঠান—কেদার ও ভবী।]

ভবী। কি হবে ঠাকুরপো?

কেদার। যা হবে সে ভালোই হবে। কেত্তর ডাকাতের সঙ্গে দল পাকিয়ে নৌকো লুঠ করতে যাওয়া—এ কি আর এম্নি এম্নি যাবে? বেঁধে সদরে চালান দেবে!

ভবী। পুলিস এসেছে?

কেদার। আসে নি আবার! গোটা গাঁ ঘিরে ফেলেছে পুলিসে—সমস্ত পুরুষ

মানুষ আটক করেছে, মেয়েদেরও আটক করবে। এরপর কি হবে দেখতেই পাবে!

ভবী। ছিষ্টে নাকি মারা পড়েছে?

কেদার। ছিষ্টে, বলাই, কালু, হরা সব ব্যাটা। মুকুন্দ দাদা আর তারণদাদা ছিল ক্ষেত্তর খুড়োর সঙ্গে নৌকোয়—ওরা ধরা পড়েছে।

ভবী। হাজতে নিয়ে গিয়েছে?

কেদার। যাবে না? রাহাজানি, লুট, খুন-খারাবি—এ কি চাট্টিখানি কথা নাকি? তাই ত আগেই বলেছিলাম.বৌ যে চলো সবাই সহরে, খেটে-খুটে খাবো—তা না গাঁয়ের মাটি কামড়ে পড়ে থাকলে। এখন বোঝো মজাটা! মধ্যে থেকে তোমাদের জন্যে আমি শুদ্ধু ফাঁপরে পড়লাম!

ভবী। তুমি কেন গেলে না সহরে?

কেদার। মাইরি বলছি বৌ, শুধু তোমারি জন্যে। তুমি অবিশ্যি চাও না আমাকে—কিন্তু আমি ত আর তা বলতে পারি না।

ভবী। যাও ঠাকুরপো, বাজে বকো না। হ্যাঁ, ফটকে গোঁসাই নাকি জখম হয়েছে?

কেদার। হবে না? ছিষ্টে তাকে গাঁড়াসা দিয়ে কুপিয়েছে। ইস, আর একটু আগে যদি যেতে পারতাম।

ভবী। কোথায়?

কেদার। না, না, এম্নি বলছি।

[পাগড়ী মাথায় ছিষ্টিধরের প্রবেশ]

ছিষ্টিধর। ক্যাদারদা যে? গোটা গাঁ'কে পুলিসের হাতে তুলে দিয়ে, এখন বুঝি ভালোমানষী ফলাতে এসেছো মেয়েদের কাছে?

কেদার। তার মানে?

ছিষ্টিধর। তার মানে বোঝাচ্ছি এসো। [হাত চেপে ধরলো] আমরা ত মরেইছি, তোমাকেও নিয়ে যাবো সেই সঙ্গে।

কেদার। এ কি? এ কি? দেখো বৌ, ছিষ্টের জুলুম দেখো।

ছিষ্টিধর। জুলুম? হারামজাদা হুটীর পুত্তুর, তুমি না পুঁটীকে ফটকে গোঁসাইয়ের ঘরে পাঠিয়েছিলে? তুমি না আগেভাগে গিয়ে আমাদের মৎলব গোঁসাইদের জানিয়ে দিয়েছিলে? আজ তোমায় জ্যান্ত পুঁতে ফেলবো!

কেদার। আমি, আমি কি জানি ?

ছিষ্টিধর। চুপ, এক্ষুণি গলা টিপে দোব কথা বললে। চল হারামজাদা, দেখবি চল কি করেছিস তুই।

কেদার। ভালো হচ্ছে না কিন্তু ছিষ্টিধর।

ছিষ্টিধর। ভালো হচ্ছে না! সাত-সাতটা লোক খুন হয়েছে, দু'কুড়ি লোক পড়েছে পুলিসের হাতে—গোটা গাঁ ঘেরাও হয়েছে—বাড়ী-বাড়ী খানাতল্লাসী হচ্ছে, ছানা-পোনা মেয়ে-মদ্দ সব চালান হয়ে যাবে। এ সবের জন্যে দায়ী কে ?

ভবী। ছেড়ে দাও ঠাকুরপো, ভগমানই ত মেরেছে আমাদের—ও আর কি করবে ?

ছিষ্টিধর। ভগমান ? ভগমান মানি না আমি। বিনি দোষে এত দুঃখ কেন পায় মানুষ ?

কেদার। বিনি দোষে ? ডাকাতি করতে যাওনি দল বেঁধে ?

ছিষ্টিধর। বেশ করেছি—গাঁ'কে গাঁ না খেয়ে ধুঁকছে, আর ঐ শুওরের বাচ্চারা লোকের মুখের ভাত কেড়ে নিয়ে মোটা দামে বেচে টাকা করছে—যে পুরুষের বাচ্চা, এক বাপের ব্যাটা, সে তাদের মুণ্ডু ভাঙবে না ত কি করবে ? তোর মতো বাঁদীর ব্যাটা সবাই ?

কেদার। মুখ সামলে কথা বলবি ছিষ্টে।

ছিষ্টিধর। এই যে বলি। [প্রহার আরম্ভ করলো।]

কেদার। ওগো, কে আছো গো ? মেরে ফেললে গো! ও পুলিস, এই পাড়ায় এসো গো—এই যে ছিষ্টে ডাকাত !

[পুঁটীর প্রবেশ]

পুঁটী। ও কি, ও কি করছো ? ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও। আমার কথা রাখো।

ছিষ্টিধর। আচ্ছা, দিলাম ছেড়ে, যা তোর বাবাদের বলগে যা। পুঁটী, ফটকে গোঁসাইয়ের মুড়োটা কাল দু'ফাঁক করতামই—শুধু এই নেমকহারামটার জন্যে পারিনি। আধকাটা করে রেখে এসেছি শালাকে। যা, যা, ভাগ এখান থেকে এক্ষুণি !

[কেদারের প্রস্থান]

পুঁটী। ক্ষেত্তর ঠাকুরদা, বাবা, মুকুন্দ জ্যাঠা, সবাই নাকি ধরা পড়েছে?

ছিষ্টিধর। না, কেউ ধরা পড়েনি। সব্বাই বন-জঙ্গলে গা-ঢাকা দিয়ে আছে। আমিও।

ভবী। ও কি, কিসের হৈ-হৈ? অত লোক কেঁদে উঠছে কেন?

ছিষ্টিধর। পুলিস, পুলিস আসছে—তল্লাসীতে। পালিয়ে এসো বৌ, পালিয়ে আয় পুঁটী—নইলে মান থাকবে না কারুর।

ভবী। ছেলেমেয়ে দুটো··

ছিষ্টিধর। থাক ঘরে ঘুমিয়ে—ওদের কিচ্ছু বলবে না, নাবালক। হল্লা চলে গেলেই আবার ফিরে আসবো। ঐ এসে পড়লো—আর দেরী করো না! পালিয়ে এসো, শীগ্রী পালিয়ে এসো! [সকলের প্রস্থান।]

[প্রবল হুঙ্কারে ঝড় ও সেই সঙ্গে বৃষ্টি সুরু হল। তারপরই গোঁ-গোঁ শব্দে নদী ছাপিয়ে এলো বান। কল কল করে জল এগুতে লাগলো—তারণ গোয়ালের মেটে বাড়ীটা মড় মড় করে ভেঙে পড়লো। চতুর্দ্দিক থেকে উদভ্রান্ত নর-নারী ছুটে পালাচ্ছে উঁচু জায়গার সন্ধানে। এক দিক থেকে উন্মাদের মতো ছুটে এলো ভবী, পুঁটী, পেছন পেছন ছিষ্টিধর, আর তারণ। উঠানে তখন এক-কোমর জল—বাড়ীর চিহ্নও নেই।]

ভবী। গোপাল, বুঁচী?

তারণ। গোপু, বুঁচু?

ভবী। ওরে আমার গোপাল রে, ভেসে গিয়েছে রে বাবা আমার! ওরে বুঁচীরে! ছেড়ে দাও, দেড়ে দাও আমাকে—আমি ভেসে যাবো, ওদের সঙ্গে ভেসে যাবো।

পুঁটী। মা-মা!

ছিষ্টিধর। থামো বৌ, থামো। কোনখানে পালিয়ে থাকলে প্রাণে আছে, নইলে আর নেই!

তারণ। যাক, যাক, ভেসে যাক—ঠাণ্ডা হক। পুড়ে যাচ্ছিল, ভেতর পুড়ে যাচ্ছিল ক্ষিধের জ্বালায়।

পুঁটী। ওগো তোমরা খুঁজে দেখো গো।

ছিষ্টিধর। এই জলে কোথায় খুঁজবো? কোথায় টেনে নিয়েছে সেই একরত্তি বাচ্চাদের!

পুঁটী। তবু একবার দেখো এসে।

ছিষ্টিধর। দাঁড়াতে পারছি না, ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে—চলো ডাঙায় উঠি। এসো দাদা, এসো বৌ, ঐ দেখো টিলার ওপর কত লোক দাঁড়িয়ে—ঐখানে গিয়ে দাঁড়াইগে আমরাও।

ভবী। না, না, যাবো না। যেখানে আমার বুঁচী গেছে, গোপাল গেছে, আমি সেখানেই যাবো—আমায় তোমরা ছেড়ে রেখে যাও গো।

তারণ। আহা-হা—বাবারে, কত কষ্ট পেলি আমার ঘরে এসে!

[জলের বেগ বাড়লো, পুঁটী হঠাৎ ছিটকে পড়ে
ভেসে যেতে লাগলো।]

ছিষ্টিধর। ভয় নেই পুঁটী, ভয় নেই। এই আমি আছি।

[দু'জনেই ভেসে চললো। উঁচু টিলার ওপর থেকে ক'জন লোক এগিয়ে এলো।]

প্রথম। তোমরা কে গো? এই জল থেকে উঠে এসো।

তারণ। সর্ব্বনাশ হয়েছে বাবা, আমার ছেলে-মেয়ে ভেসে গিয়েছে। ঐ দেখো, বড় মেয়েটাও যাচ্ছে—তোমরা বাঁচাও গো।

দ্বিতীয়। ওদের ভগমান বাঁচালে তবেই বাঁচবে। একেবারে হাঙরের মুখে গিয়ে পড়েছে। তোমরা উঠে এসো, উঠে এসো।

[ক'জনে টেনে তুলে নিলে দু'জনকে টিলার ওপর।]

ভবী। না, না, ঝাঁপ দিই। আমার আর বেঁচে কি হবে?

প্রথম। বাঁচতেই হবে মা, প্রাণ বড় কঠিন জিনিষ। এই দেখো মা আমরা—আমরাও ত সর্ব্বস্ব খুইয়েই বেঁচে আছি!

দ্বিতীয়। যারা গিয়েছে, তারা শান্তি পেয়েছে। কি কষ্ট! দুটো ভাত—ভগমান, তা-ও দিলে না। ঘর নিলে, সংসার নিলে, শেষে স্রোতে ভাসিয়ে দিলে। বেশ, বেশ, এই ত সুবিচার!

তারণ। শান্তি পেয়েছে, ওরা মরে শান্তি পেয়েছে। কিন্তু আমরা—আমরা কি নিয়ে বাঁচবো?

প্রথম। প্রাণ নিয়ে, তা ছাড়া আর ত কিছুই নেই!

পায়ে চলার পথ

[বহু লোক হৈ-হৈ করে দৌড়ে যাচ্ছে।]

দ্বিতীয়। কোথায় যাচ্ছো গো তোমরা ?

একজন। কোথায় যাচ্ছি তাকি কি জানি ? পথ-ঘাট সব ত জলে ডুবে গেছে। চারিদিক অন্ধকার। চলেছি এষ্টেশানের পানে তাক করে।

প্রথম। কেন, এষ্টেশানে কি ?

আর একজন। গাড়ী ধরবো—সহরে যাবো, চটকলে খাটবো।

দ্বিতীয়। চটকলে ? এত লোক নেবে ?

অন্য একজন। ঢের, ঢের—হাজার হাজার লোক নেবে। বাঁধা মজুরী, বাঁধা ঘর, সস্তা দামের চাল-ডাল—চলো না তোমরাও।

প্রথম। চলো যাই।

দ্বিতীয়। চলো। পথ ঠাহর হচ্ছে না যে !

তারণ। এসো আমার সঙ্গে। আমি পথ চিনি।

ভবী। গাঁ ছেড়ে কোথায় যাবো গো ? আমার সর্ব্বস্বি যে গাঁথা রইলো এই গাঁয়ে—আমার পুঁটু, আমার গুপু, আমার বুঁচু !

তারণ। এই গাঁ—এ শ্মশান, সব ফেলে গেলাম এখানে। রাক্ষুসী—সমস্ত ছেলে-মেয়ে খেয়েও ওর ক্ষিধে মিটবে না ! আর না, আর এখানে নয়। যাবো, চটকলেই যাবো।

ভবী। ওরে আমার কি হল রে !

তারণ। বাপরে, কি তোড় হাওয়ার ! আকাশ ভেঙে যেন খ্যাপা ঝড় নেমেছে। আর রক্ষে নেই কারুর !

ভবী। ওরে গোপালরে, ওরে পুঁটীরে, ওরে বুঁচীরে, তোদের কোথায় রেখে যাচ্ছি রে !

প্রথম। যেখানে গেলে সব ক্ষিধে মিটে যায়, সব দুঃখ চুকে যায়, সেইখানে রইলো মা।

[সকলের প্রস্থান।]